দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২১ তম সংখ্যা ❖ ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ২
- 'দেবতা নই মানুষ', মোদীর স্বীকারোক্তি ৩
- বিশ্ব রাজনীতির হাল হকিকত ৩
- নাগরিক স্মৃতিচারণা ৪
  মৌলবি মুজিবর রহমান এক বিস্মৃত সাংবাদিক
- ফিরে দেখা ৬
  মুখুজ্যের সঙ্গে আমার আলাপ
- এস এ ডাঙ্গে ও তাঁর একটি ভুলে যাওয়া বই ৯
- কলকাতা বইমেলায় এবার নেই বাংলাদেশ ১০
- বাংলাদেশ কোন পথে ১১
- ড. বি আর আম্বেদকর সংক্ষিপ্ত জীবন আলেখ্য
- দুই ''কার''-এর চেলাদের ঠেলাঠেলি হাসিম শেখ ১৭
  আর রামা কৈবর্ত ' র কি যায় আসে ?
- কত হাজার মরলে তবে মানবে তুমি শেষে, ২০
  বড্ড বেশী মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে
- শতবর্ষে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২১

➲সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা ও দেশ - এর সংজ্ঞা আরএসএস - কে শিখতে হবে

আর.এস.এস - এর স্বরসংঘচালক মোহন ভাগবত গত ১৩ জানুয়ারি ইন্দোরে হিন্দুত্ববাদীদের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন ভারতবর্ষ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়েছে গত বছরের ২২ জানুয়ারি। কেন ? এই দিনের মাহাত্ম কি ? শ্রী ভাগবত বলেছেন ওই দিন অযোধ্যায় রাম মন্দির সম্পূর্ণ হবার পর পূজার্চনা শুরু হয় ।তিনি বলেছেন এই ২২ জানুয়ারি দিনটিকে ' প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী ' রূপে পালন করা উচিৎ। এই দিনটিতে শত শত বছরের পরাধীনতার পর প্রকৃত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রী ভাগবতের মতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট দেশ স্বাধীন হয় , সংবিধানও গৃহীত হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও দেশ নাকি সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি। এখন রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পর দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে একটি সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানে উপাসনা শুরু হওয়ার দিন কি করে স্বাধীনতা দিবস হয় ? তাও আবার ওই মন্দির নির্মিত হয়েছে অপর একটি সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ধ্বংস করে। সুপ্রিম কোর্টও যাকে বড় ধরনের ফৌজদারী অপরাধ বলে তাদের রায়ে উল্লেখ করেছে।

সকলেই জানেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভা কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়নি। সংঘ নেতারা কেউ কখনও জেলে যান নি। আমাদের সংবিধান স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে উদ্ভুত। দেশ স্বাধীন হওয়া মাত্র ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে রচিত হয় এই সংবিধান , যা ধর্ম নিরপেক্ষ ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। সংঘ পরিবার সংবিধান প্রণয়নের বিরোধিতা করে বলেছিল মনু সংহিতা অবলম্বন করে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। এই দাবী গণ পরিষদ প্রত্যাখ্যান করে। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকা। এই হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার ২০০২ সালের আগে কখনও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতো না। এই সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রথমাবধি মনে করত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংবিধান অকার্যকর। রাহুল গান্ধী বলেছেন আর.এস.এস - বিজেপি চক্র চায় দেশ চালিত হবে এক ছায়াচ্ছন্ন , লুক্কায়িত , গোপন সমাজের দ্বারা। এরা রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থায় নিজেদের লোকদের বসিয়ে দিয়েছে।রাহুল গান্ধী বলেন তাই তাঁর লড়াই এখন এই রাষ্ট্র যন্ত্রেরও বিরুদ্ধে। এ কথা বলার জন্য বিজেপি তাঁকে ' শহুরে নকশাল ' বলেছে , যিনি কিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।এরা দেশ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের পার্থক্যও বোঝেনা। স্বাধীনতা ও দেশ - এর সংজ্ঞা এদের এখন শিখতে হবে।

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না

সৌর বসু

সম্প্রতি ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট ২০২৪ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে, তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের পর্যালোচনা ভিত্তিক একটি রিপোর্ট । এই রিপোর্টটির ভিত্তিতে যে কর্মসংস্থানের ছবি ফুটে উঠেছে তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

২০০০ থেকে ২০১২ সাল অবধি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র ১.৬ শতাংশ। ২০১২ সাল থেকে ২০১৯ অবধি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ২০০০ থেকে ২০১৯ এই সময়কালে কর্মসংস্থান কৃষি ক্ষেত্র থেকে তুলনামূলকভাবে উচ্চ উৎপাদনশীল অকৃষি ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। মহামারির সময় এই রূপান্তরটির গতি হ্রাস পায়। ২০০০ থেকে ২০১৯ অবধি নির্মাণ শিল্প এবং পরিষেবা খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহামারীর সময় কৃষি ক্ষেত্রের বাইরে কাজের সুযোগের অভাবে, পুনরায় কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরে পরিষেবা খাতে এবং নির্মাণ খাতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয়। পরিষেবা খাতে আইটি, সফটওয়্যার প্রভৃতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। আইটি, সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উচ্চ বেতনে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। এছাড়া এই পরিষেবা গুলি র মাধ্যমে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পায়।। কিন্তু মহামারির পর এই ছবিটি ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। মহামারী চলাকালীন নিয়মিত বেতনের চাকরিতে তরুণদের সংখ্যা হ্রস পায়। পরিবর্তে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানে যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের কর্মসংস্থানে আরো অবনতি হয়। মহিলারা গভীরভাবে অবৈতনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে এই রিপোর্টটি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে।

শিক্ষিত যুবক যুবতীদের বেকারত্ব একটি ভয়ানক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। বেকারদের মধ্যে মাধ্যমিক স্তর বা আরও উচ্চতর যারা শিক্ষা লাভ করেছে, ২০০০ সালে তারা ছিল ৩৫. ২%। ২০২২ সালে এই সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছে ৬৫.৭ শতাংশে। বেকারদের মধ্যে যারা লিখতে পড়তে পারে না তাদের সংখ্যা ৩.৪ শতাংশ। কিন্তু যারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছে (গ্র্যাজুয়েট) তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৯.১% , আমাদের দেশের চাকরির বাজার শিক্ষিতদের নিযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বৃহৎ নয় অন্যদিকে যারা মাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েট হয়েছে , তারা চাকরির বাজারে প্রবেশ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি।

২০২৩ -২৪ সালের হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে রিপোর্ট বা গৃহস্থালি খরচের সমীক্ষা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । উপর্যুপরি দু বছর রিপোর্টটি প্রকাশিত হলো। বাস্তবিক পক্ষে এটা বেশ বিস্ময়কর। কারণ বিজেপি সরকার জাতীয় নমুনা সমীক্ষা রিপোর্ট এবং জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা দেশের পক্ষে বিশাল ক্ষতিকর এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের দেশের গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় সর্বমোট ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৫৩টি পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গৃহস্থালী ব্যয় সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৩- ২৪ সালে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রতিমাসে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪১২২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে এর পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ৬৯৯৬ টাকা। যদিও এই হিসেবের মধ্যে সামাজিক কল্যাণমূলক বিনামূল্যে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার খরচ ধরা ছিল না। সামাজিক কল্যাণমূলক প্রাপ্তিকে গ্রহণ করলে গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২২৭ টাকা এবং শহরাঞ্চলে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০৭৮টাকা। রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার সর্বনিম্ন স্তরের গরীব পাঁচ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিমাসে মাথাপিছু ব্যয় ১৬৭৭ টাকা এবং শহরে এলাকায় জনসংখ্যার সর্ব নিম্ন পাঁচ শতাংশের মাথাপিছু ব্যয় ২৩৭৬টাকা। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় সর্বোচ্চ স্তরের ধনী জনসংখ্যার মাসিক মাথাপিছু ব্যয় ১০১৩৭টাকা এবং শহরে এলাকার সর্বোচ্চ স্তরের জনসংখ্যার মাসিক মাথাপিছু ব্যয় ২০৩১০ টাকা।

আমাদের দেশের রাজ্য গুলির মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় সিকিমে সর্বোচ্চ মাসিক মাথাপিছু ব্যয় ৯৩৭৭ টাকা এবং শহর এলাকায় এই ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৯২৭ টাকা। ছত্রিশগড়ে গ্রামীন এবং শহর এলাকায় মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম। ১৮ টি রাজ্যের মধ্যে ৯ টি রাজ্যে গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় মাসিক মাথাপিছু ব্যয় সর্বভারতীয় গড়ের থেকে বেশি। মাসিক মাথাপিছু ব্যয় যে সমস্ত রাজ্যের সর্বভারতীয় গড়ের থেকে কম পশ্চিমবঙ্গ মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রিপোর্টে আরো প্রকাশ পেয়েছে যে পানীয় এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যয়ের পরিমাণ , দুধ সবজি মাছ ডিমের থেকে বেশি। পরিবহন পোশাক বিনোদন প্রভৃতির অবদান খাদ্য বহির্ভূত ব্যয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা। গৃহস্থালী খরচের ২০২৩--২৪ এর যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আশার আলো খুব বেশি নেই।

নরেন্দ্র মোদির সরকার অর্থনীতিতে বৈষম্য হ্রাসের যে কথা প্রচার বারম্বার করে চলেছেন, তার কোন প্রতিফলন রিপোর্টটিতে নেই। গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয়ের উপরে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ মাসিক গড় ব্যয়ের নিচে অবস্থান করছে। এটা কোনভাবেই অর্থনৈতিক উন্নতি বা বৈষম্য কমার লক্ষণ নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা সর্বদা প্রচার করে চলেছেন। অথচ রিপোর্টটিতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ভারতীয় গড়ের থেকে কম। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য তথ্য পরিবেশনের প্রতিযোগিতা আর কতদিন চলবে! ❐

‘দেবতা নই মানুষ’, মোদীর স্বীকারোক্তি

অমিতাভ সিংহ

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বারানসীতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর উপলব্ধি হয়েছিল যে তিনি ঈশ্বরের সন্তান। তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছেন দেশের মানুষের (পড়ুন গৌতম আদানির মত গুটিকয়েক প্রতারক ব্যবসায়ীর) মঙ্গলের জন্য। প্রকারান্তরে তাঁর প্রয়াত মাকে ও মাতৃগর্ভকে অস্বীকার করেছিলেন। নিজেকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ে বসাতে তাঁর কোনও দ্বিধা হয়নি।

বারানসী লোকসভার জনগণ তাঁকে গতবারের তুলনায় অনেক কম ভোট দিয়ে মাত্র লাখ দেড়েক ভোটে জয়ী করলেও একটা জিনিস বোঝা গিয়েছিল যে বিরোধীরা এই কেন্দ্রে কোনও ওজনদার বা ভাল প্রার্থী দিলে মোদীর পরাজয় নিশ্চিত ছিল। এমনকি যে অযোধ্যায় হৈ হৈ করে বাবরি মসজিদ ভেঙে আদালতের বিতর্কিত রায়ের পরে রামমন্দির নির্মিত হল সেখানেও তথাকথিত রামভক্তর পরাজয় দেখিয়েছিল মোদীর এই ফাজলামি তারা মেনে নিতে পারছেন না।

ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির সম্বিত পাত্র জনসমক্ষে দাবী করেছিলেন জগন্নাথদেব নাকি মোদীর ভক্ত। আসলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য খোদ মোদীসহ তার চাটুকাররা মোদীকে ইশ্বরের আসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মোদী গত সপ্তাহে একটি পডকাস্টে তাঁর সম্ভবত বোধদয় হয়েছে যে তিনি ইশ্বর নন,একজন গড়পড়তা মানুষ ছাড়া বেশী কিছু নন। যদিও খোলাখুলি তিনি তা স্বীকার করেন নি। তাঁর এক চাটুকার এই পডকাস্টটিতে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সেখানে মোদী বলেছেন ‘ আমি মানুষ,দেবতা নই। আমারও ভুল হতে পারে’। অর্থাৎ তিনি যে শুধু ভুল নয় বিভিন্নক্ষেত্রে অন্যায়,অবিচার বা অপরাধ করেছেন দেশের মানুষের সঙ্গে তা স্বীকার না করে ভুল হতে পারে বলে সাফাই গেয়েছেন। দুঘন্টা ধরে যে পডকাস্টটি তৈরী করা হয়েছে তাতে সাক্ষাৎকারী একবারও দেশের জ্বলন্ত ইস্যুগুলি, যেমন ক্রমবর্ধমান বে- রোজগারী, গত আটচল্লিশ বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্ব, টাকার দাম ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে চলা, মূল্যবৃদ্ধি অথবা দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ কিংবা তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে একটাও প্রশ্ন করেন নি। বরং উক্ত চাটুকরটিকে প্রশ্ন করতে দেখা গেছে মোদীর ছেলেবেলা,পড়াশোনা বা কিভাবে মনের ওপর চাপ কমাতে হয় ইত্যাদি সাদামাটা ও ফালতু প্রশ্ন করতে। গত ১১ বছর ধরে মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেও তাঁকে একবারও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে দেখা যায় নি,যেখানে মোদীর ভাষায় দুর্বল প্রধানমন্ত্রী মৌনিমোহন মনমোহন সিং দশ বছরে ১১৫ টি সাংবাদিক সম্মেলন করে যে কোনও বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

মোদী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্রিটিশদের চাটুকার সাভারকরের তুলনা করে বললেন তাদের দুজনেরই মতবাদ আলাদা হলেও লক্ষ এক ছিল, তা হল দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু ইতিহাস বলে যতদিন সাভারকর কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন তার আদর্শ ও লক্ষ ছিল দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু যেই তিনি বন্দী হয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে গেলেন তখনই তার বীরত্ব উধাও হয়ে গেল। মোট পাঁচবার সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে মুচলেকা দিয়েছিলেন যে তিনি আর কোনও দিন ব্রিটিশবিরোধী কোন কাজ করবেন না।তারপর তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী জীবন তিনি ব্রিটিশদের গোলামী করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এমনতর একজনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর তুলনা! তবে তিনি মহাত্মার জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা স্বীকার করেছেন।

তিনি আবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে তার নিজের বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে বলেছেন। তবে এই সম্পর্কের জন্য তিনি চিন কতৃক ভারতের ২০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি দখলের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন নি। তবে এটা দেখা গেল মোদীর এই উপলব্ধির পর বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ২০০ কোটি ডলারের লগ্নি তুলে নিয়েছেন। একথা জানিয়েছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়রাম নরেশ।একই সঙ্গে এক ডলারের মূল্য ৮৬ টাকা ছাপিয়ে যাওয়াটা যে দেশের অর্থনীতির পক্ষে বিপদ তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চুপ থাকাটাও যে বেশ পীড়াদায়ক তা মানুষ বুঝতে পারছেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে শেয়ার বাজারের বিশাল পতন। এর ফলে আরবিআই সুদের হার কমাতে না পারার জন্য লাগামছাড়া হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি। একইসঙ্গে চড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি।মোদীর আমলে দেশ যে সবদিক থেকেই ক্রমাগত দেউলিয়া হতে চলেছে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? ❐

বিশ্ব রাজনীতির হাল হকিকত

শুভ বসু

বিশ্ব রাজনীতি আজ এক সংকটের মুখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে একটি বিশ্বআন্তর্জাতিক আধিপত্যের সূচনা করেছিল তা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ডোনাল ট্রাম্পের নেতৃত্বে সংকটের মুখে। মূলত পাঁচটি ইংরেজী ভাষী রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এবং নিউজিলান্ড কে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাস্ট্র এই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আধিপত্য গড়ে তুলেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর বিজয়ী শক্তির পক্ষ থেকে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থিনীতি নতুন করে গড়ে তোলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের দৌত্যের ফলে চীনের সঙ্গে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক গড়ে তোলে।কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। বাংলাদেশ মুক্ত হয়। ভিয়েতনাম থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য অপসারণ করতে বাধ্য হয়। এটি ছিল ছোট পদক্ষেপ কিন্তু বৃহৎ পরিসরে তারা এর ফলে ঠান্ডা যুদ্ধে এগিয়ে যায়।

চীন ১৯৭৯ সালে তার অর্থনীতিকে নতুন ভাবে সাজায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তথ্য প্রযুক্তি আমদানি করতে সক্ষম হয়। পরে আফগানিস্তানে পাকিস্তানের সহযোগিতায় জেহাদি শক্তির জোরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাস্ত হয়।গত শতকের নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির পতনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাস্ত হয়।

তাহলে ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর এরকম অবস্থা কেন ? তার কারণ বাজার অর্থনীতির সংকট এবং তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে চাকরির পরিসর সীমিত হয়ে আসছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধর ফলে এখন মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তার ফলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল ট্রাম্পের পুনরাবির্ভাব। ট্রাম্পের একলা চলো নীতি মার্কিন প্রভাব কে সীমিত করে দেবে। ট্রাম্প ন্যাটোর ভক্ত নন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সঙ্গে খুব বেশি ভাব রাখতে চান না। কানাডার সঙ্গে শুল্ক লড়াইতে নামতে চান। তাঁর বক্তব্য মায় হু ডনের মতো। আমি ডন আমি চালাবো দেশ এবং আমি একাই শক্তি। চীনের সঙ্গে তিনি অর্থনৈতিক যুদ্ধে নামতে চান। কিন্তু ভুলে গেছেন যে চীনের বাজারে বিনিয়োগ করেছে মার্কিন বাণিজ্য গোষ্ঠী। চীনের অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি কে পঙ্গু করে দেবে। রাশিয়া একলা চলার নীতিতে আছে। চীনের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা বাড়তে পারে। রাশিয়া এবং চীন একত্র প্রভূত বাজার দখল করে রাখবে নিজেদের অভ্যন্তরে।

দক্ষিণ এশিয়ার উপরে এর প্রভাব কি হবে? আমার ধারণা ভারতের শক্তি বৃদ্ধি হবে দক্ষিণ এশিয়াতে। পাকিস্তানের সরকারের তাঁদের নিজেদের দেশে বৈধতা নেই। অর্থনীতি ক্ষণভঙ্গুর। আফগানিস্তনের সঙ্গে সংঘর্ষ তাদের কে বিব্রত করে রাখবে। মার্কিন চাপ থাকবে তালিবানের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘর্ষে। শ্রীলংকার অর্থনীতি বিপর্যস্ত। নেপাল ভারত চীনের মধ্যে পরস্পরের বৈরিতার সুযোগ নেবে কিন্তু নেপালের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব সীমিত। নেপাল ভারতের উপর পণ্য চলাচলের জন্যে নির্ভরশীল। তার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ২০০০ সালের পর থেকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ফলে এবং বস্ত্র শিল্পের জন্যে এবং অভিবাসনকারীদের রেমিট্যান্সের ফলে বেশ সবল অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের অস্থির রাজনীতি ভারতের পক্ষে আরো সুবিধা করে দেবে দক্ষিণ এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারে। যতক্ষণ না বাংলাদেশে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একটি সুস্থির সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ এই ডামাডোল ভারতের পক্ষে ভূ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা করে দেবে।

ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় জনতা পার্টির হাত শক্ত করবে বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক ঘটনাবলী। ইউনুস সাহেব কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি ছাত্র জনতা এবং জামাতের সহযোগিতায় দেশ চালাবেন না নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নতুন সরকার গঠন করবেন। মানুষ হয়তো পড়ে হাসবেন আমার প্রতিবেদন কিন্তু ভবিষ্যৎ বলে দেবে আমার বিশেষণ সত্যি কি না ? আর বাংলাদেশ পাকিস্তানের অক্ষ শক্তি একটা মিথ। পাকিস্তান সরকার নিজের দেশের জনসাধারণের কাছে অপ্রিয়। পাকিস্তানের জনগণ ইমরান খান কে চান। তালিবান পাকিস্তানের উপর না খোশ। বাংলাদেশের উচিত ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ় করার।

ভারতের এবং বাংলাদেশের উভয় পক্ষে গভীর শঙ্কার কারণ মিয়ানমারের ঘটনাবলী। সেখানে আরাকান আর্মির সূত্রে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষে ঝগড়া চলছে। আরকান আর্মি নতুন করে অস্ত্র সম্ভার পেয়ে রাখাইন প্রদেশ প্রায় দখল করে নিয়েছে। কে দিয়েছে এই অস্ত্র সম্ভার ? চীন না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ? মিয়ানমার এ এথনিক কনফ্লিক্ট এর ফলে কোনো স্থায়িত্ব থাকবে না। ফলে এটাই হবে নতুন চ্যালেঞ্জ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে। ❐

নাগরিক স্মৃতিচারণা

মৌলবি মুজিবর রহমান
এক বিস্মৃত সাংবাদিক

মিলন দত্ত

১

অধুনা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট থানার নেহালপুর গ্রামে ১৮৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি মৌলবি মুজিবর রহমানের জন্ম। আমিনুর রহমানের ‘মৌলভী মুজিবর রবমান’ বইয়ে মুজিবর রহমানের যে বংশ পরিচয় রয়েছে সেখানে দাবি করা হয়েছে,নেহালপুর গ্রামের পত্তন হয়েছিল ১৭৮৯ সালে; নবাব মর্শিদকুলি খাঁর আমলে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দান করা একশো বিঘে লাখেরাজ জমিতে বসত শুরু করেন বর্ধমান জেলার রসুলপুর থেকে আগত শেখ নুর মোহাম্মদ ও তাঁর এক ভাই। সেখ নুর মোহাম্মদের বংশধররাই মূলত পরবর্তীকালে নেহালপুর গ্রামে পৃথক পরিবারে বিভক্ত হয়ে একই পাড়ায়বসবাস করছিলেন। নুর মোহাম্মদের পুত্রের নাম শেখ মোকিম। নুর মোহাম্মদ মারা যান ১৭৮৩ সালে। মোকিমের পুত্র হরিফুল্লার দুই ছেলে ছিল, কাদের বক্স এবং আহমদ বক্স। আহমদ বক্সের তিন পুত্রের নাম এলাহি বক্স, আবদুল খালেক এবং আবদুর রউফ, আর ছিল সাত কন্যা। এলাহি বক্সের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলাবি মুজিবর রহমান।

মুজিবর রহমানের জন্ম সাল নিয়েও সামান্য বিভ্রান্তি রয়েছে; আমিনুর রহমান জানাচ্ছেন ১৮৭১ সাল, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধানে পাচ্ছি মুজিবর রহমানের জন্ম ১৮৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি। নেহালপুরে তাঁর কবরে যে ফলকটি বসানো হয়েছে জন্ম তারিখ ওটাই লেখা আছে। কিন্তু ভুঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত 'Selections From The Musssalman ১৯০৬-১৯০৮' গ্রন্থের Forward-এ আনিসুজ্জামান লিখছেন, মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯৬৯ সালে। আবার বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির 'বাংলাপিডিয়া'য় (ইংরেজি এবং বাংলা সংস্করণ) 'খান, মুজিবর রহমান১ (১৮৭৩-১৯৪০)' নামে যে ভুক্তিটি রয়েছে সেখানে মৌলবি মুজিবর রহমানকেই বোঝানো হয়েছে; জন্ম সাল ১৮৭৩। তবে বাংলাপিডিয়া ছাড়া আর কোনও সূত্র থেকে মুজিবর রহমানের 'খান' পদবী বা উপাধী পাচ্ছি না। এই তথ্যগুলোর কোনওটাতেই যেহেতু তথ্যসূত্রের হদিস দেওয়া হয়নি তাই বিভ্রান্তিটুকু মেনে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে।

কাছেই ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে ১০ টাকার জলপানি পান। সেই সময় স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও ধনী পরিবারের ছেলেদের পিছনে ফেলে দরিদ্র একটি মুসলমান ছেলের এনট্রান্সে ফার্স্ট ডিভিশন এবং জলপানি পাওয়ার ঘটনা ওই অঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ফলে পরিবারের অর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। নাবালক দুই পুত্র আর একটি কন্যা নিয়ে বিধবা মা। জলপানির ভারসায় তিনি কলকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন। এফ এ পাশ করে আর তাঁর পক্ষে কলেজের পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বাবার মৃত্যুর পরে চাচা মুন্সি আবদুর রউফ ছিলেন তাঁর অভিভাবক। মুন্সি আবদুর রউফ কলকাতায় চলে যান সার্ভে অফিসে ড্রাফসম্যানের কাজ নিয়ে। পরে চাকরি ছেড়ে তিনি ৪৬/৩, ক্যানাল ইস্ট রোডে বিঘে খানেক জমি লিজ নিয়ে ভেড়া-ছাগল কেনাবেচার আড়ত গড়ে তোলেন।কিন্তু গ্রামে তাঁর মা- ভাইবোনদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে কলেজের পড়ায় ইতি টেনে তাঁকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়। কিছু দিন গ্রামে কাজকর্ম করার পরে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে শিয়ালদা কোর্টে পেশকারের একটা অস্থায়ী চাকরি জুটিয়ে নেন। তা দিয়ে নিজের খাওয়া-পরা, মায়ের জন্য গ্রামে টাকা পাঠানো ছাড়াও কিছু টাকা সঞ্চয় হচ্ছিল। পদে পদে দুর্নীতির সঙ্গে অপোস করারপ্রশ্ন এসে পড়ছিল পেশকারের কাজে। এর চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা অনেক সম্মানজনক হবে ভেবে তিনি পেশকারের কাজ ছেড়ে দেন।

এর পর তিনি ১৭৬/২, বৌবাজার স্ট্রিটে একটি মনিহারি দোকান দেন। সেটা ছিল ১৯০০ সাল। তখন তাঁর বয়স ২৫ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। সেই দোকান থেকে বিশাল কিছু আয় তাঁর ছিল না।'দ্য মুসলমান' পত্রিকার বিংশতি বর্ষপুর্তি বিশেষ সংখ্যায় পত্রিকার যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল সেখানে পাচ্ছি ১৯০৯ নাগাদ দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়। 'দ্য নুসলমান'-এর ২০০৭ সালে ৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় মুজিবর রহমানের ওই দোকানের স্বদেশি মনোহারি পণ্যের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। ওই বিজ্ঞাপন থেকে আমরা বুঝতে পারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সমকালে মান্য একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদককে খাওয়া-পরার খরচ জোটাতে মনোহারি দোকান চালাতে হয়; পত্রিকা থেকে কোনও সাম্মানিক তখনও পর্যন্ত পাচ্ছেন না। এ ছাড়া ওই বিজ্ঞাপনটি মুজিবর রহমানের চরিত্রের আরও একটা দিক উন্মোচিত করে, তা হল তিনি ওই অর্থিক অনটনের মধ্যেও তাঁর দোকানে কেবল স্বদেশি পণ্যই রাখতেন এবং বিক্রি করতেন। অধিক কাটতির এবং অনেক বেশি লাভজনক বিদেশি পণ্য দোকানে রাখতেন না। এমনই ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা। পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখব মৌলবি মুজিবর রহমান নিজে এবং তাঁর পত্রিকা 'দ্য মুসলমান' স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে কীভাবে জড়িত এবং বাঙালি মুসলমান সমাজকে ওই অন্দোলনের অভিমুখে কীভাবে চালিত করছেন। আরও দেখবো তিনি তাঁর সংবাদপত্রের মাধ্যমে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমান সমাজের ন্যায্য অধিকারগুলো আদায় করার জন্য 'দ্য মুসলমান'কে কীভাবে ব্যবহার করেছেন। 'দ্য মুসলমান'-এর ওই একই প্রতিবেদন থেকে জানতে পারছি, পত্রিকা মাস দেড়েক চলতে না চলতেই প্রথম সম্পাদক মৌলবি আবুল কাশেম অসুস্থ হয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন। ম্যানেজারির দায়িত্ব তো ছিলই এবার পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও মৌলবিমুজিবর রহমানের ওপর বর্তায়। কিন্তু তাঁকে একই সঙ্গে তাঁর মনোহারি ব্যবসা সামলাতে হতবলে তিনি অনেকটাই অসুবিধের মধ্যে ছিলেন। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে 'দ্য মুসলমান' ৭১, লোয়ার সার্কুলাররোডে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকেই পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ওই বাড়িতে যে ছাপাখানাটিছিল তার মালিক ছিলেন আবদুর রসুল সাহেবের স্ত্রী। পত্রিকা চালাতে গিয়ে নিজের ব্যাবসা যথেষ্ট দেখাশোনা করতে না-পারায় তাঁর মনিহারি দোকানটি ইতিমধ্যেগুটিয়ে ফেলতে হয়। দোকান গুটিয়ে ফেলার আরও একটা কারণ হল, এতদিন পত্রিকার দফতর ছিল তাঁর দোকানের পাশের বাড়িতে। সেখান থেকে পত্রিকার দফতর চলে যায় ৭, বৌবাজার স্ট্রিটে; সেখান থেকেও তাঁর দোকানের দূরত্ব বেশি ছিল না। কিন্তু পত্রিকা দফতর লোয়ার সার্কুলার রোডে চলে যাওয়ার পরে দোকানটা চালু রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। নিশ্চিত আর্থিক অনটন সত্ত্বেও দোকানটা তাঁকে বন্ধ করতে হয়। তারপর প্রেসের সুপারভাইজারের দায়িত্বও তিনি কাঁধে তুলে নেন।

তাঁর স্বপ্ন ছিল 'দ্য মুসলমান'কে কোনও একদিন দৈনিক পত্রিকা করবেন। সেই লক্ষ্যেই হয়তো তিনি ১৯২৬ সালে 'দ্য মুসলমান' সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশ করতে শুরু করেন। একই সঙ্গে একটি বাংলা সাপ্তাহিক 'খাদেম' প্রকাশ করেন। সে পত্রিকা অবশ্য চলেছে কয়েক বৎসর মাত্র। পত্রিকার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য 'দ্য মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড' নামে একটি লিমিটেড কোম্পানি

গঠন করেন। কোম্পানির শেয়ার বিক্রির জন্য তাঁকে সারা বাংলা সফর করতে হয়েছে একাধিকবার। অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁর সেই সফরের বিজ্ঞপ্তি এবং সংবাদ আমরা 'দ্য মুসলমান' পত্রিকার পাতায় দেখেছি। ১৯২৯ সালের ৬ ডিসেম্বর সংখ্যার সাতের পাতার প্রায় পুরোটা জুড়ে একটা খবরের শিরোনাম ছিল 'The Mussalman' to be a Daily/M. Mujibur Rahmen's Fund Collection Tour/Enthusiastic Support Everywhere/Furthet Tour To Commence Within a Feu Days'। সেই সংবাদে লেখা হচ্ছে,'মুসলিম পরিচালিত একটি দৈনিক সংদপত্রের প্রয়োজনীয়তা মুসলমানরা গভীরভাবে অনুভব করছে। পত্রিকারসপ্তাহিক সংস্করণ থেকে দৈনিক সংবাদপত্র করতে গেলে অন্তত ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। ওই টাকা দ্য মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

'দ্য মুসলমান'-এর সম্পাদক এবং কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর মৌলবি মুজিবর রহমান প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মফস্বল সফরে ছিলেন। আগস্ট মাসের ১৬ তারিখে তিনি চট্টগ্রাম যান, সেখান থেকে ত্রিপুরা জেলা, নোয়াখালি এবং তারপর আবার চট্টগ্রামে যান। কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করে ১৫ ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফিরে আসেন।' বাংলার মুসলমান সমাজের জন্য একটা ইংরেজি দৈনিক করার স্বপ্ন সফল করতে তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন। পরের বছর ২৪ জানুয়ারি সংখ্যাতেও দেখি 'দ্য মুসলমান' দৈনিক করার জন্য মুজিবর রহমান আবারও তহবিল সংগ্রহে বেরচ্ছেন। সেই খবরে রয়েছে মৌলবি মুজিবর রহমান দৈনিক বের করার প্রকল্পে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুমিল্লায় পৌঁছেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জেলার বন্ধুদের অনুরোধে তাঁকে তাঁর সফর রমজান মাসের শেষ পর্যন্ত স্থগিত করতে হয়েছে। তিনি কুমিল্লার করতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন। আগামী ৪ঠা মার্চ যাবেন ময়মনসিংহ, যেখানে তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সেখান থেকে টাঙ্গাইল মহকুমার অন্যান্য অঞ্চলে যাবেন। ময়মনসিংহ সফর শেষ করে ঢাকায় আসবেন তারপর রংপুর, তারপর বরিশাল এবং বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য জেলায় যাবেন। মার্চ মাসের একটি সংখ্যায় একটা ছোট খবরে লেখা হচ্ছে, 'দ্য মুসলমান'-এর সম্পাদক মৌলবি মুজুবর রহমান মঙ্গলবার আসাম নেলে কলকাতা থেকে দিনাজপুর দেলার ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন। 'দ্য মুসলমান'কে দৈনিকে রূপান্তরিত করার জন্য তিনি সেখানে 'দ্য মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানি'র শেয়ার বিক্রি করবেন। টানা তিন-চার বছর ধরে তিনি গোটা বাংলা চষে বেড়িয়েছেনতহবিল সংগ্রহের জন্য।

সেই অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারেও মুজিবর সহমানের সংযম এবং সততা ছিল নজিরহীন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সাংবাদিক হয়ে ওঠা মোহাম্মদ মোদাবেবর 'মৌলবী মুজিবর রহমান' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, 'আমার মনে আছে, দি মুসলমানের শেয়ার বিক্রি করতে গিয়ে তিনি কাউকে বেশী সংখ্যক শেয়ার কিনতে দেননি। তিনি বলতেন, সংবাদপত্র ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা কম। সুরতাং আপনাদের বেশী ক্ষতি করতে চাই না।' রাজনীতি বা পত্রিকার কাজে তাঁকে সফর করতে হয়েছে লাহোর থেকে রেঙ্গুন। (পরের সংখ্যায়)

পুরনো লেখা ফিরে দেখা

মুখুজ্যের সঙ্গে আমার আলাপ

আনিসুজ্জামান

১৯৫১ সালে, সবে আইএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল' পড়ার সুযোগ হলো। কী আনন্দের সঙ্গেই না তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক-এর আলোচনা পড়েছিলাম, আজ তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। পদাতিক-এর যতগুলো উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তার সবই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অনেক খুঁজেছিলাম পদাতিক, বছরখানেকের আগে হাতে আসেনি। বরঞ্চ সদ্য প্রকাশিত আমার বাংলা পেয়ে গিয়েছিলাম বইয়ের দোকানে। ১৯৫২ সালের আগস্টে কুমিল্লায় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যখন রমেশ শীলের কবিগান প্রথম শোনার সৌভাগ্য হলো, তখন আমার বাংলায় পড়া তাঁর বৃত্তান্ত বিশেষভাবে মনে পড়ছিল।

'পদাতিক' পড়েছিলাম সম্মোহিত হয়ে। মনকে বিশেষ করে নাড়া দিয়েছিল 'মে-দিনের কবিতা', 'সকলের গান', 'কানামাছির গান', 'বধূ', 'এখানে' ও 'ধাঁধা'। আর ভালো লেগেছিল 'অতঃপর'-এর চিঠির কাঠামো। সব কবিতাই যে ভালো করে বুঝেছিলাম, তা নয়। তার মধ্যেও 'দলভুক্ত' বা 'নারদের ডায়রি'র মতো কবিতার ছন্দ, ধ্বনি, চিত্রকল্পে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। 'পদাতিক'-এর সম্মোহন কখনো কাটেনি, কাটবার নয়।

১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। তাতে যোগ দিতে কলকাতা থেকে এলেন নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গ দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। দেবীপ্রসাদের সব বই-ই তখন টাটকা টাটকা পাওয়া যাচ্ছে এবং আমরাও সোৎসাহে পড়ছি। সুতরাং খুব খুশিমনে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলাম। সুভাষদা খোঁজ করেছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে তাঁর সহপাঠী ফররুখ আহমদের। তাঁকে জানালাম, আদর্শগত কারণে তিনি আমাদের সম্মেলন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। সুভাষদা জানতে চাইলেন, তিনি যদি ফররুখের কাছে যেতে চান, দেখা হতে পারে কি না। ফররুখ আহমদ রেডিওতে কাজ করতেন এবং ব্রডকাস্টিং হাউসের উল্টোদিকের রেস্তোরাঁয় বেশির ভাগ সময়ে তাঁকে পাওয়া যেত। সেই চা-খানায় নিয়ে গেলাম। অনেক দিন পরে দুই বন্ধুর-দুই মেরুর বাসিন্দার মিলনের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

সুভাষদা এবারে চাইলেন ইলা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে। সে-কাজটা বরঞ্চ কঠিন ছিল। তিনি দীর্ঘ কারাবাস থেকে বেরিয়ে তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিথিল পুলিশ-পাহারায় চিকিৎসাধীন। একজন সুপরিচিত ভারতীয় কমিউনিস্টকে ওই অবস্থার মধ্যে নেওয়ার ঝুঁকি ছিল। তবু গেলাম। ইলা মিত্রকে সুভাষদা দুটি বই উপহার দিয়েছিলেন; একটি 'নাজিম হিকমতের কবিতা', অপরটি হয়তো 'চিরকুট'। ইলা মিত্র তখন এত দুর্বল যে কথা বলতে পারেন না। তাঁর ইঙ্গিত অনুসরণ করে বইটি থেকে দুটি কবিতা পড়ে শোনালেন সুভাষদা। তারপর বই রেখে আমরা চলে এলাম।

এ-ঘটনার একটি পাদটীকা আছে। এ-সময়ে রমেন মিত্র আত্মগোপন করে ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর মাঝেমধ্যে দেখা হতো, কিন্তু আমি তাঁকে জানতাম অন্য নামে। আমাদের হাসপাতালে যাওয়ার পরে তিনি যখন আমাদের বাসায় এলেন, আমি মহা উত্তেজিতভাবে ইলা মিত্রকে দেখে আসার ঘটনা বিবৃত করলাম তাঁর কাছে স্বামীর কাছে স্ত্রীর গল্প করছি, তা না জেনে। রমেনদাও নির্বিকারভাবে আমার বর্ণনা শুনে গেলেন।

ঢাকায় স্বাক্ষরশিকারিদের খাতায় দু-চার ছত্র কবিতা লিখে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন সুভাষদা। একজনের খাতায় লিখেছিলেন :

লিখব না, লিখব না কক্ষনো নাম
সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথাটার
কী এমন দাম !
আরেকজনের খাতায়
আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে;
থাকুক গে পাহারা।

আরেকটিতে :
খুলে দিলাম জানলা
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারে সেই বাংলা।

সবগুলো আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করলাম। জানি না এসব চরণ আগেই তাঁর মাথার মধ্যে ছিল কি না কিংবা কোথাও ছাপা হয়েছিল কি না। পরে শেষ দু-টুকরোর মাঝখানে দুটি চরণ জুড়ে দিয়ে রূপ পেতে দেখি 'পারাপার' কবিতাটিকে, তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ফুল ফুটুক বইতে। সেখানে বিন্যাসটা অন্য রকম :

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে;
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

সুভাষদার সঙ্গে এরপরে দেখা হয় কলকাতায়, ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে। তাঁর কাছে যেতেই তিনি নিয়ে গেলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁদের বলেছিলাম যে, নিকিতা ক্রুশ্চভের স্তালিন-সমালোচনা আর দশ জায়গার মতো পূর্ব বাংলার বামপন্থী আন্দোলনের বেশ ক্ষতি করেছে। আমার মনে হয়েছিল, ওঁদের অভিজ্ঞতাও ছিল একই রকম। পরে যখন 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতায়পড়েছিলাম;

পৃথিবীকে নতুন ক'রে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়।

তখন সেদিনের আলাপচারিতার কথা বিশেষভাবে মনে পড়েছিল। সেবারে কলকাতায় দু-তিন দিন ছিলাম মাত্র, তাই দেখাসাক্ষাৎ আর হয়নি। ১৯৫৯-এ আবার কলকাতায় গেলাম আমার গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করতে। সেবারে সুভাষদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন অজিত দত্তের কাছে। ওই একই বাড়িতে বুদ্ধদেব বসুর বাস, এ কথা জেনে আমি উল্লেখ করেছিলাম কালের পুতুল-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 'সকলের গান' কবিতার 'কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে' চরণটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর আনা অসংগতির অভিযোগের কথা।

আমার মনে হয়েছিল, কবিতাটির রাজনীতি অপছন্দ হওয়ায় বুদ্ধদেব বসুর কাছে এটি সংগতিহীন মনে হয়েছে, নইলে কুয়াশার পক্ষে কঠিন হতে বাধা নেই এবং কমরেডের সঙ্গে বাসরের বিরোধও কল্পিত। আমার কথার পরে সুভাষদা স্বভাবসিদ্ধ নম্র উচ্চারণে বলেছিলেন, বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে অমন মন্তব্য তিনি আশা করেননি।

সুভাষদার সঙ্গে আর গিয়েছিলাম সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্তের কাছে। আমার অনুরোধে সুভাষদা কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গেও একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার গৃহকর্তা কলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব এনায়েত করিম বললেন, দেশে যেখানে সদ্য সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে কলকাতায় এসে কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে আমার দেখা করাটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। সুভাষদাকে সে-কথা জানিয়ে সাক্ষাৎকার থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম।

মুজফফর আহমদের সঙ্গে আমার সেই সাক্ষাৎ ঘটল ১৯৭১-এ, তত দিনে আমি কলকাতায় শরণার্থী। সুভাষদা আমার অবস্থায় সত্যিই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে একদিন নিয়ে গেলেন লেনিন সরণির একটি বাড়িতে। সেটাই তখন পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশ সহায়ক পরিষদের দপ্তর। সেখানে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলো আর নতুন পরিচয় হলো তরুণ

সান্যালের সঙ্গে। সেদিন অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রজয়ন্তীর। বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা-বিষয়ে আমাকে কিছুবলতে হয়েছিল এবং সেই অকিঞ্চিৎকর বক্তব্য লিখে দিতে হয়েছিল পরে, পরিচয়-এ প্রকাশের জন্য। আরেক দিন সুভাষদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাসায়। তার আগের সন্ধেয় এক সভায় আমাদের এক সহকর্মীর বক্তৃতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমার কাছে সে-কথা তিনি গোপন করলেন না। আমিও তাঁর বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, এ-কথা বলে তাঁকে প্রসন্ন করতে পেরেছিলাম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সুভাষদার আশা ও আশঙ্কার নানা পরিচয় তখন ফুটে উঠেছিল তাঁর ছোট ছোট কাজে, মৃদু মৃদু উক্তিতে। ছেলে গেছে বনে বইতে বাংলাদেশ নিয়ে দুটি কবিতা আছে একটি ‘কড়াপাক’; মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় উপলক্ষে লেখা; আরেকটি ‘একুশে ফেব্রুআরি’; সেটা ঠিক কখন লিখেছিলেন, তা জানা নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পরে সুভাষদা বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছিলেন, কিন্তু আমি তখন চট্টগ্রামে থাকায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। দেখা হতো আমি কলকাতায় গেলে, বিশেষ করে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের অতিথি ভবনে থাকলে; সেটা সুভাষদার বাসার খুব কাছে। একবার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন; দেবীদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। একবার সুভাষদার পুরস্কারলাভের কথা জানলাম, তাঁর গাড়ি কেনার কথা হলো। আরেকবার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে, তাঁর সঙ্গে সুভাষদার বন্ধুত্বের কথা, তাঁর প্রথম রেকর্ডের জনপ্রিয়তার কথা এবং তাঁর বন্ধু হিসেবে সুভাষদার সম্মানলাভের গল্প বললেন। সুভাষদা যে সিপিআইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, সে-প্রসঙ্গও একবার উঠেছিল, তবে রাজনীতি নিয়ে বেশি কথা হয়নি।

আমার সহকর্মী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক, গোলাম মুস্তাফাকে নিয়ে একবার সুভাষদার বাসায় গেছি। তত দিনে আমি চট্টগ্রাম থেকে চলে এসেছি ঢাকায় এবং সুভাষদার সঙ্গে দেখা হলেই তাঁকে তাগাদা দিচ্ছি ঢাকায় আসার জন্য। এবারে যেতেই বললেন, ঢাকায় আসবেন। আমি জানতে চাইলাম, ‘কখন?’ তিনি বললেন, কবিতা-সম্মেলনে যোগ দিতে। আমাদের রাষ্ট্রপতি, জেনারেল এরশাদ ছিলেন এই সম্মেলনের আয়োজক। সুতরাং একটু বিষাদের সুরেই বললাম, ‘এরশাদের অতিথি হয়ে যাবেন ঢাকায়?’ সুভাষদা বেশ একটু মজার হাসি হেসে বললেন, ‘কত দিন ধরে ভাবছি ঢাকায় যাব। তোমরা এরশাদকে হটাবে, তার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন তোমরা তাকে তাড়াতে পারছ না, আমি আর কত দিন বসে থাকব?’ তাঁর যুক্তির কাছে হার মানলাম একরকম। সুভাষদা ঢাকায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলেন যে দেখাই হয়নি, শুধু টেলিফোনে কথা হয়েছিল। বছর তিনেক আগে কলকাতায় পৌঁছেই শুনি সুভাষদার ৭৫তম জন্মবার্ষিক-উপলক্ষে তাঁর সংবর্ধনা, ভারতীয় ভাষা-পরিষদের মিলনায়তনে। গেলাম তো বটেই, বিনা প্রস্তুতিতে বক্তৃতাও দিতে হলো। আমি কৌতুক করে বলেছিলাম, সুভাষদাকে তাঁর কত অল্প বয়স থেকে চিনি। সেই চেনার কথাই এতক্ষণ বলে যাচ্ছি। সুভাষদার যে-স্নেহ লাভ করেছি, তা আমার জীবনের পরম সম্পদ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক তো কেবল ব্যক্তিগত হতে পারে না। বাংলা কবিতাকে ভাবে ও প্রকরণে যে-নিজস্ব রূপ সুভাষ মুখোপাধ্যায় দান করেছেন, তার জন্য আমরা ঋণী তাঁর কাছে। গদ্যে পদ্যে, মৌলিকে অনুবাদে, তাঁর হাতে বিস্তর ফসল ফলেছে। আমি কেবল ‘পদাতিক’-এর কথা বলেছি, তারপরও কবি আমাদের অজস্র দিয়েছেন। ১৯৪৮-৫০, কারাগারের এই দুটি বছর ছাড়া, সুভাষ লিখেছেন অক্লান্তভাবে। তাঁকে বহুপ্রজ বললে ভুল হবে না। পরিমাণ যেহেতু উৎকর্ষের প্রমাণ নয়, তাই তার বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ‘পদাতিক’-‘চিরকুট’-এর সঙ্গে ‘যা রে কাগজের নৌকো’-‘ধর্মের কল’-এর শৈলীগত পার্থক্য অন্যমনস্ক পাঠকের চোখেও ধরা পড়ে। তাঁর বহু কবিতা আমাদের অনেকের জীবনোপলব্ধির অংশ হয়ে আছে। তাঁর কবিতার বহু চরণ মুখে মুখে ঘুরে প্রবচনপ্রতিম হয়ে উঠেছে, আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী আসনে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

সুভাষদা, ভালো থাকুন। মুখুজ্যে, তুমি লেখো। ❐

(লেখাটি আমরা নিয়েছি মতিউর রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত ‘শতবর্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি’ থেকে। তবে লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা’, শঙ্খ ঘোষ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা ১৯৯৮)

এস এ ডাঙ্গে ও তাঁর একটি ভুলে যাওয়া বই

সিদ্ধার্থ সেন

২০২৪ সাল পেরিয়ে ২০২৫ সাল চলে এল। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পালন চলছে এখন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের কতিপয় মার্ক্সীয় ভাবধারায় প্রভাবিত যুবক একত্রিত হয়ে কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এদের মধ্যে অন্যতম মুজ্জাফর আহমেদ, এস ভি ঘাটে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার প্রমুখ। এস এ ডাঙ্গে তখন জেলে থাকার জন্য পার্টির প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও তার প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন করার পিছনে তিনি ছিলেন অন্যতম রূপকার। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি।

শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের জন্ম ১৯৯৯ সালে। সেই অর্থে তাঁরও জন্মের ১২৫ বছর পার হয়ে গেল ২০২৪ সালে। মহারাষ্ট্রের

নাসিকের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের স্বরাজ আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এরপর ১৯২০ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানিক পড়াশোনা মাঝপথেই ইতি ঘটান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গান্ধীর মতপন্থার উপরে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। এই সময়ে সদ্য ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব হয়েছে। পত্রপত্রিকায় তার খবর পেয়ে তিনি মার্ক্সীয় ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। অচিরেই তিনি ' গান্ধী বনাম লেনিন ' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। এতে সমাজ পরিবর্তনে গান্ধী ও লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে গান্ধীর মতবাদের সীমাবদ্ধতা ও সেই সাথে লেনিনের মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। ১৯২১ সালে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি দেশে বিদেশে বিভিন্ন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সুবাদে প্রবাসে কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়।

১৯২২ সালে আরো কয়েকজন সহকর্মীর সাথে প্রতিষ্ঠা করেন নতুন এক সাপ্তাহিক পত্রিকা সোশালিস্ট। ভারতের আরো বিভিন্ন প্রান্তে এই ভাবে প্রকাশিত হওয়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও তার সাথে জড়িত ছোট ছোট গোষ্ঠীর সমন্বয়েই অবশেষে গড়ে ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

অবশ্য এই লেখার উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বা ডাঙ্গের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা না। বরং আমাদের দৃষ্টি এখন সরিয়ে নিয়ে যাব ৭৫ বছর আগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিকে, যার কথা আমরা ভুলেই গেছি। সেটি ডাঙ্গেরই লেখা একটি বই, যেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, আজ থেকে ৭৫ বছর আগে। বইটির নাম India From Primitive Communism to Slavery। বইটি ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হলেও লেখা হয়েছিল ১৯৪২-৪৩ সালে, ইযারভেদা জেলে বন্দি থাকা অবস্থায়। ওই সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠনে ব্যস্ত। যার মধ্যে অন্যতম হলো গিরনি কামগর ইউনিয়নের মতো লড়াকু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া। তার পাশাপাশি মার্ক্সবাদী মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজাও জরুরি হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম মার্ক্সীয় মতবাদের আলোকে ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ করা। আর এই দায়বদ্ধতা থেকেই এই বই লেখা।

সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হল উৎপাদনের হাতিয়ার এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ। উৎপাদনের হাতিয়ার বা উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্ক সব সময়ে এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ফলে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনটা হয় লাফিয়ে লাফিয়ে। আর এই ভাবে প্রাচীন যুগ থেকে পৃথিবীর সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সামাজিক সম্পর্ককে কতগুলো যুগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র। আর এই পথ ধরেই যে পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থা আসতে চলেছে তা হল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। মোদ্দা কথায় বলতে গেলে এটাই মার্ক্সীয় দর্শনের মূল কথা। আর এটা মার্ক্স -এঙ্গেলস ইউরোপীয় সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

এখন প্রশ্নটা হল, প্রাচীন ভারতবর্ষেও কি ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই রকম সমাজ ব্যবস্থার বিভাজন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ডাঙ্গের আলোচ্য বইটি India From Primitive Communism to Slavery লেখার প্রয়াস। বলা বাহুল্য কাজটি সহজ ছিল না। কারণ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে এই গবেষণার উদ্যোগ এই প্রথম। আর ভারতের সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে সেই সময় পর্য্যন্ত যে কটি বই লেখা হয়েছে, সেগুলি বেশিরভাগই ঔপনিবেশিক শক্তির প্রচারের প্রভাবে দুষ্ট । তার উপরে জেলখানায় বসে এই বই লেখা একটি দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। কোনো প্রয়োজনীয় বই বা পত্র পত্রিকা সেখানে মেলে না। তাই তাঁকে বেদের নানা স্তোত্র ও রামায়ন-মহাভারতের মত উপাখ্যানের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে এই বই লেখার রশদ জোগাড় করতে হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য ভান্ডার ছেঁচে তিনি দেখিয়েছেন প্রাচীন যুগে বিভিন্ন গণ বা গোষ্ঠীর উপস্থিতি, যেগুলি ছোট ছোট জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত, যার সমাজব্যবস্থা ছিল মূলতঃ মাতৃতান্ত্রিক। মায়ের নামেই তাদের পরিচিতি, যেমন দিতি, অদিতি ইত্যাদি। ধনসম্পত্তি বলতে মূলতঃ গোধন ও অশ্ব; সেগুলি ওই গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি, ব্যক্তিগত অধিকার তাতে ছিল না। যজ্ঞের প্রসাদ সবাই ভাগ করে নিত। আর তাকেই প্রাচীন সাম্যবাদ বলেছেন ডাঙ্গে। তারপর এল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদয়, এলো বর্ণপ্রথা। বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বর্ণ বিভাজন শুরু হল। এল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণভেদ। এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর লড়াইয়ে যারা পরাজিত হতো, তাদেরকে বিজয়ী পক্ষ বন্দি করে নিজেদের দাস হিসেবে ব্যবহার করত। এইভাবে বর্ণ বিভক্ত সমাজে একটি নতুন বর্ণ, শুদ্র, যুক্ত হয়। তাদের নাম দেওয়া হয় দাস। ক্রীতদাস প্রথার এটাও একটা রূপ। আর এইভাবেই লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন উপাখ্যান থেকে একের পর এক উদাহরণ দিয়ে বইটি সাজিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা নিয়ে এই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ নয়। বইটিতে দেওয়া তথ্য ও বিশ্লেষণ ইতিহাস বলে গণ্য করা যায় না। তার প্রথম কারণ, যে কাহিনীগুলি বইতে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি লোকমুখে প্রচলিত প্রাচীন উপাখ্যান থেকে তুলে নেওয়া; কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বা সেই আমলে লিখিত ইতিহাস তখন পাওয়া যায় নি। এর উপরে বইটি জেলে বসে লেখা। লেখার উপযুক্ত পরিবেশ বা প্রয়োজনীয় বইপত্র লেখকের কাছে ছিল না। লেখাটি মূলতঃ স্মৃতিনির্ভর। দ্বিতীয়তঃ, এতে শুধু আর্যদের সমাজজীবনের কথাই লেখা হয়েছে। অথচ আর্যরা ভারতে বহিরাগত। তারা ভারতবর্ষে এসেছিল আজ থেকে আনুমানিক চার হাজার বছর আগে। তার আগেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষ এই ভূখণ্ডে বাস করেছে, সমাজবদ্ধভাবেই।

এ ছাড়াও আছে সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু নদীর ধারে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতা আর্যরা আসার আগেও প্রায় তিন হাজার বছর জুড়ে টিকে ছিল। তা ধংস হয়ে যাবার পরেও তার মূল স্রোতটি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সেখানকার তৎকালীন শিকারী ও ফল সংগ্রহকারক জনজাতির সাথে মিলে দ্রাবিড় সভ্যতার সৃষ্টি করে। তাদের ভাষার লিখিত লিপিও ছিল। এই দুই স্রোত মিলে যাবার পর্বে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস প্রায় পুরোটাই আমাদের অজানা। ঘটনাচক্রে সিন্ধু সভ্যতার ধংসাবশেষ আবিষ্কার হয়েছিল আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে, ১৯২৫ সালে। আলোচ্য বইতে এই আবিষ্কারের উল্লেখ আছে, কিন্তু আবিষ্কৃত তথ্য তখন ভালোভাবে সামনে আসে নি। তাই এ ব্যাপারে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে।

ভারতের জনজীবনের ধারায় আর একটি সতন্ত্র স্রোতও এসে মিশেছে। সেটি হলো সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, খাসি ইত্যাদি জনজাতি। আর্যদের উপাখ্যানে এদের নিষাদ বলেই উল্লেখ আছে। ভাষাবিদরা এদের ভাষার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমান,মালয়েশিয়া, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের অস্ট্রোএশিয়াটিক মানুষের মিল পেয়েছেন। ডিএনএ পরীক্ষাতেও এই দুই আপাতঃ বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের মধ্যে মিল পাওয়া গেছে। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা কিভাবে ভারতবর্ষে এলেন সেটি পরিষ্কার নয়, তবে তাদের জীবনযাত্রা ও সমাজজীবন আর্যদের থেকে অনেক ভিন্ন ছিল, সেটি বলাই বাহুল্য। কাজেই এই যে সব ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বর্তমান ভারতবর্ষে বিরাজমান, তাদের মধ্যে সমাজ বিবর্তন আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস প্রথা, লেখক উল্লিখিত পন্থাতেই হয়েছে কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তাই এ ব্যাপারে আরো অনেক গবেষণার প্রয়োজন।

তবুও আজ থেকে ৭৫ বছর আগে এই স্বশিক্ষিত মানুষটি প্রত্যক্ষ রাজনীতির ফাঁকে ফাঁকে কারান্তরালে বসে বিপুল পরিশ্রম করে সমাজ বিবর্তনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভেবেছেন এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সেই দিক থেকে দেখলে বর্তমান বইটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাচীন ভারতের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস খোঁজার দিকে অন্যতম পথিকৃৎ। ❐

কলকাতা বইমেলায় এবার নেই বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বহরমপুর বইমেলায় বাংলাদেশের বই বিক্রি করার ‘অপরাধে’ বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশনীর স্টল ভাংচুর করে ‘ছত্রপতি শিবাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ট্রাষ্ট’ নামে হিন্দুত্ববাদী একটি সংগঠনের লোকেরা। সংগঠনটি আরএসএস-এর শাখা হিসেবে কাজ করে। সে দিন সন্ধে সাতটা নাগাদ ওই সংগঠনের কুড়ি পঁচিশ জন সদস্য বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশনীর ব্যানার জোর করে টেনে নামিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যায়। হামলা হয় আচমকাই। হামলাকারীরা স্টলে ঢুকে ঘোষণা করে মেলায় বাংলাদেশের বই বিক্রি করা যাবে না। তোমরা ব্যানারে লিখে রেখেছ ‘ এখানে বাংলাদেশের বই পাওয়া যায়। এটা কেন লিখেছ?’ এই বলে তারা ব্যানার খুলে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন জমা হন।

এই সব কথা বার্তার মধ্যেই আরএসএস-এর ওই বাহিনী আবার মেলায় যায় এবং নানা আপত্তিকর কথা বলতে থাকে। কয়েকজনের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার, ভারতীয় পতাকা পোড়ানো নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলে। কথা কাটাকাটি, তর্ক বিতর্ক চরম পর্যায়ে চলে যায়। অনেক পরে একজন পুলিশকর্মী সেখানে পৌঁছন। তিনি সকলকে থামাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে আরও কয়েক জন পুলিশ যায়। অফিসার পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য সঙ্গী অফিসারকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যদি আপনারা লিখিত অভিযোগ জানাতে চান তা হলে করুন। আমরা ব্যবস্থা নেব। ততক্ষণে আরএসএস গুন্ডারা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। এই সময় তালিম প্রকাশনির এক কর্মচারী সেকেন্ড অফিসারকে জানান, তাদের স্টলেও হামলা হয়েছে। বই এলোমেলো করে দিয়েছে। বলেছে বাংলাদেশের বই বিক্রি করা যাবে না। সেকেন্ড অফিসার তাকেও আশ্বাস দেন এবং স্টলে পুলিশের ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশনীর কর্মচারী লিখিত অভিযোগ জমা দেন।

তাতে কোনও কাজ হয়েছে হলে মনে হচ্ছে না। শিক্ষাও হয়নি। হিন্দুত্ববাদীদের ভয়ে হয়তো বা ভক্তিতে বইমেলাকে আরও সংকুচিত করা হয়েছে। কলকাতা ‘তথাকথিত’ আন্তর্জাচিক বইমেলায় এবার বাংলাদেশের বই বিক্রিতেই কেবল নিষেধাজ্ঞা নেই, বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকেই। এ জিনিস ঘটছে প্রায় ত্রিশ বছর পর, ১৯৯৬ সাল থেকেই কলকাতা বইমেলার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। মাঝখানে এতগুলি বছরে বইমেলা জায়গা পাল্টেছে, স্টল বেড়েছে অনেক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য আধুনিক প্রকরণ আত্মস্থ করে সে চরিত্রে হয়ে উঠেছে আরও আন্তর্জাতিক। এই আন্তর্জাতিকতার মধ্যে একটা চিরচেনা আন্তরিকতার স্পর্শ বয়ে আনত বাংলাদেশের বই, কলকাতা বলেই আরও; একই মাতৃভাষায় কথা বলা অথচ রাজনীতির ফেরে আলাদা ভূখণ্ডের বাঙালি যে আজও কেমন উদ্বেল পড়শি দেশের সাহিত্য, মননচর্চা ও এই সবেরই ধারক-বাহক বই নিয়ে, বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে প্রতি বছর পাঠকের ঢল ছিল তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ এবার কলকাতা বইমেলায় থাকছে না। এমনকি যাঁরা বাংলাদেশের বই বিক্রি করেন সেই প্রকাশকদের ডেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেনো বাংলাদেশের বই স্টলে না রাখেন। কোনও গণ্ডগোল হলে তাঁর তার দায় নেবেন না।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে উদ্ভূত

পরিস্থিতিই এর কারণ, তার ছায়া পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ কূটনীতিতে। এরই মধ্যে চলছে নানা কথার চালাচালি বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, মেলায় বাংলাদেশের উপস্থিতি নিশ্চিত করায় তাদের হাত নেই, পুরোটাই নির্ভর করছে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। আবার প্রতি বছর মেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ে গিল্ডকে জানানো হয় কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের তরফে, এ বছর তা হয়নি। বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক জানিয়েছেন বাংলাদেশি প্রকাশকদের মেলায় আসার আগ্রহ ষোলো আনা, কিন্তু সাড়া মেলেনি ভারত থেকেই। এই বিভ্রান্তিতে হাওয়া দিচ্ছে সমাজমাধ্যমে দুই দেশের বাঙালির বাগ্‌যুদ্ধ, মেলায় বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ঘিরে ডেকেছে বিদ্রুপও বিদ্বেষের বান। কূটনৈতিক নীরবতা ও সমাজমাধ্যমের কুৎসিত বচসা, এই দুইয়ের মাঝে ক্ষতিটি হল কার? সাদা চোখে দেখলে বাংলাদেশের প্রকাশনা ও বই-বণিকদের। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিপুল বিক্রির সুযোগ বন্ধ হল।

বইমেলা মানেই বিপুল বইয়ের সম্ভার, এই মুহূর্তে একটি দেশের সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে লেখক-চিন্তকরা যা ভাবছেন, তার ঘনীভূত গ্রন্থরূপ। এই সময়ে পদ্মাপারে বাংলা ও বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে কোন গবেষণা হচ্ছে, কেমন চলছে অনুবাদের কাজ, বিশ্ব ও বাংলার ইতিহাস সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি নিয়েই বা কী ভাবছেন লেখকেরা, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির কোন দিগন্ত খুলে গেল, বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে এক ছাদের তলায় সেই খোঁজ পেতেন এ-পারের আগ্রহী পাঠক। সমাজমাধ্যমে খড়্গহস্তরা আর যা-ই হোন প্রকৃত পাঠক নন, নইলে বই ও বইমেলাকে ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার উদারতাটুকু তাঁরা দেখাতেন। অস্থির সময়ে উস্কানিও প্রবল হয়, প্রয়োজন ছিল বই ও মননের চর্চা দিয়েই তাকে প্রশমিত করা, বাঙালির এত দিনের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সেতুটি পোক্ত করা। বইমেলায় বাংলাদেশের অনুপস্থিতি বুঝিয়ে দেবে, সেই সুযোগটি হেলায় হারাল। ❐

বাংলাদেশ কোন পথে

মনজুরুল হক

তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বানরের ওঠা-নামার দশা এখন বাংলাদেশের। দেশের কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর ডজন ডজন কারখানা বন্ধ। প্রায় দুই শতাধিক গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের অর্ডার ভারতে ট্রান্সশিধ হয়েছে। দেশের অর্থনীতি ধসে পড়েছে। কারেন্সি নোট ছেপে বাজার থেকে ডলার কিনে রিজার্ভ বাড়িয়ে আত্মতুষ্টি হচ্ছে। প্রায় দশটি ব্যাংক ধুকছে। শেয়ার বাজার থেকে ৩৩ হাজার কোটি উধাও। ভরা মৌসুমে মোটা চাল ৭০ টাকা। গার্মেন্ট সেক্টরের কাঁচামাল ভারত থেকে আসছে না। প্রায় ৯৪ ভাগ ভারত নির্ভর আমদানীর অনেকটাই বন্ধ। গত ৫ মাসে কোনও সেক্টরে নতুন বিনিয়োগ আসেনি। গার্মেন্ট সেক্টরে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক বেকার। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দিতে আইএমএফ থেকে বেলআউট লোন চাওয়া হয়েছে। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানী-খুন-জখম নিত্য ঘটনা। মব ভায়োলেন্স পুরো দেশ জেরবার। এরই মধ্যে আর এক অমীমাংসিত অংক দেশে এখন নির্দিষ্ট করে কয়টি সরকারের পাওয়ারবেল্ট আছে নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না।

কাগজ-কলমে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার ক্ষমতায়, অথচ দৃশ্যমান জামাত-বিএনপিসহ ইসলামিস্ট দলগুলোর হুকুমে দেশ চলছে। তৃতীয় 'সরকার' ছাত্রদের। তারা যেটা বলছেন সেটাই 'আইন'। চতুর্থ 'হিডেন সরকার' সেনাবাহিনী। নেপথ্যে থাকা তাদের শক্তিতেই ইউনূসের শক্তি। এইরকম জগাখিচুড়ি সরকারের পেছনের মূল ইন্ধনদাতা বাইডেনের ডীপ-স্টেট ও পাকিস্তানের আইএস। মসনদ ছাড়ার আগে সেই বাইডেনের প্রশ্রয়ের হাতটিও ইউনূসের মাথার ওপর থেকে উঠে গেছে ক'দিন আগে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় বসবেন এ মাসের ২০ তারিখে। তার আগেই ট্রাম্প ইন অ্যাকশন! হামাসকে ইসরায়েলি জিম্মি মুক্ত করার আল্টিমেটাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে নিয়েছেন। গত মে মাসেই ডেভিট স্লেটন মেলেকে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। গত পরশু হঠাৎ করেই তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনুমান করা যায় ট্রাম্প বাংলাদেশ থেকে 'বাইডেনের লোক' সরিয়ে নিজের লোক বসাবেন। দুনিয়ার এত দেশ থাকতে হঠাৎ ট্রাম্প এই ক্ষুদ্র দেশটির দিকে এক্সট্রা মনোযোগ দিচ্ছেন কারণ, ইউনূসের সঙ্গে তার কিছু পুরোনো বোঝাপড়া আছে। একথা স্বয়ং ইউনূসও স্বীকার করে বলেছেন-'ট্রাম্পের কেবিনেটে ৭ জন ভারতীয় বংশদ্ভূত লোক নিয়োগ পেয়েছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ স্পষ্টতই তিনি ভয় পাচ্ছেন। এর আগে ট্রাম্প বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একাধিক নেতিবাচক ট্যুইট করেছেন। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন-'ইদুরে খেয়ে যাক, তবুও বাংলাদেশে চাল পাঠাবেন না'।

অনুমান করা যায় ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দফায় বাংলাদেশের ওপর কোনও না কোনও স্যাঙ্কশন জারি হতে যাচ্ছে। সেটা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ লোন স্টপ করা, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১৫শতাংশ ট্যাক্স বসানো, জাতিসংঘকে প্রভাবিত করে পিস-কিপিংয়ে বাংলাদেশি সৈন্য না নেওয়া কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে কলকাঠি নেড়ে জ্বালানি তেলের সাপ্লাই বন্ধ করা হতে পারে।

এর মধ্যে ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশের কাছে বকেয়া ২০০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে আল্টিমেটাম দিয়েছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে দৈনিক ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুত আমদানি করে। এর মধ্যে আদানির পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ১২০০ মেগাওয়াট আসত, যা এখন

৫০০ মেগাওয়াটে নেমেছে। ত্রিপুরা থেকে আসত ১৬০ মেগাওয়াট। পাওনা ২০০ কোটি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তারাও সাপ্লাই অর্ধেক করে দেবে।

মাইনাস-৪ ফর্মুলা

ইউনূস, বিএনপি, জামাত, হিজবুত, হেফাজত, সেনাদের মিলিত মেটিকিউলাসলি ডিজাইনড পাওয়ার হাউস অনেকদিন ধরেই ২০০৬ সালের মত মাইনাস-২ ফর্মূলা নিয়ে উচ্চকীত ছিল। ৫ আগস্টে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিলে মাইনাস-২ কার্যকর হয়েছে কারণ, শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ও দেশের বাইরে। হাসিনা চলে যাওয়ার পর পরই তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছিল। এবার পুরোপুরি বাতিল হলো আরও শ'দেড়েক পাসপোর্টের সঙ্গে। শেখ হাসিনাকে ফেরৎ চেয়ে বাংলাদেশের চিঠি ভারত পেয়ে মন্তব্য করেছে-'শেখ হাসিনা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, তাকে ফেরৎ চেয়েছে অনির্বাচিত অবৈধ সরকার, যাদের আবেদনের কোনও মূল্য নেই। আমরা চিঠি পেয়েছি। যথসময়ে উত্তর দেওয়া হবে। কোনও তাড়াহুড়া নেই।' ভারতে তিনি যে বিশেষ কূটনৈতিক ডকুমেন্টস নিয়ে আছেন তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তিনি চাইলে অনির্দিষ্টকাল ভারতে অবস্থান করতে পারবেন। এ ব্যাপারে ভারতের সকল দলের ঐক্যমত্য আছে।

৮ আগস্টের পর বেগম খালেদার সবগুলো মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। তার পরও তিনি জরুরি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চাননি। তিনি আশঙ্কা করছিলেন তাকে হয়ত আর দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। অবশেষে তিনি কোনও এক বা একাধিক মহল থেকে আশ্বাস পেয়েই লন্ডনে চলে গিয়েছেন। এই আশ্বাস কে দিয়েছে আমাদের জানা নেই। অনুমান করা যায় তার যাওয়ার প্রাক্কালে সেনাপ্রধান স্বস্ত্রীক তার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তিনিই হয়ত খালেদাকে আশ্বস্ত করে থাকবেন। বেগম খালেদা দেশ ছেড়েছেন, অর্থাৎ মাইনাস-২, কারণ, তার উত্তরসূরি তারেক রহমান আগেই দেশছাড়া। একনে দাঁড়াচ্ছে হাসিনা, জয়, খালেদা, তারেক এই চার জনই দুটি প্রধান দলের কাণ্ডারি এখন দেশের বাইরে। তারা কি আদৌ দেশে ফিরতে পারবেন? এই চারজনকে বাদ দিলে বাংলাদেশে ইউনূস-জামাত গ্যাংয়ের সামনে আর কে রইল ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার? কেউ না। বাংলাদেশের রাজনীতি উপমহাদেশের 'ঐতিহ্য' অনুযায়ী পরিবারতান্ত্রিক। দুটি প্রধান দলও ঐতিহ্যগতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি। আর সেই দুটি দলের বর্তমান এবং পরবর্তী নেতৃত্বর চারজনই দেশের বাইরে তথা-মাইনাস-৪। এটা ইউনূস এবং তার স্টেকহোল্ডারদের জন্য এক মাহেন্দ্রক্ষণ। হাসিনা-জয় সঙ্গত কারণেই দেশে ফিরতে পারবেন না। তাদের উভয়ের উপর বিশেষ করে শেখ হাসিনার উপর দুইশ'র বেশি মামলা এবং দুটি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ঝুলছে। বেগম খালেদার সব মামলা প্রত্যাহার হলেও খারিজ হয়নি। তারেকের গ্রেনেড হামলার মামলাসহ অধিকাংশ মামলা প্রত্যাহার হলেও চারটি মামলা প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ করে আপিল করেছে সরকার পক্ষ। তার মানে সহসা তারেকও ফিরতে পারছেন না। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে বেগম খালেদার এই বিদেশ গমনই তার রাজনীতির সমাপ্তি? সম্ভবত, কারণ তিনি বলেছেন-চিকিৎসা শেষে হজ সেরে দুমাস পর ফিরবেন। দুমাস অনেক লম্বা সময়, বিশেষ করে দেশের যে হাল-হকিকত তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। যাচ্ছেও। আগামী ২০ জানুয়ারির পর কী ঘটবে সেটা কেউ জানে না। এই সময়ে প্রধান দুটি দলের চারজন নেতা-নেত্রী দেশ ছাড়া।

আদৌ কী নির্বাচন হবে?

ইতিহাস বলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সবচেয়ে বড় দুটি দল। তারাই পালাক্রমে দেশ শাসন করেছে। দেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ ভোটের রাজনীতিতে এই দুটি দলের সমর্থক। এখন যদি ধরে নেওয়া হয় যে 'মাইনাস-৪' কার্যকর হয়ে গেছে, তাহলে বাকি রইল জামাত নিয়ন্ত্রিত ইসলামিস্ট দলগুলো, জাতীয় পার্টি এবং তলানিতে থাকা বাম দলগুলো। এই দলগুলোর অবস্থান নড়বড়ে। সেটা মাথায় রেখেই 'কিংস পার্টি' গড়ে তোলা হচ্ছে। ছাত্রদের নিয়ে সেই সঙ্গে লীগ-বিএনপির দলছুট নেতাকর্মী এবং সিভিল-মিলিটারি ব্যুরোক্র্যাটদের নিয়ে গড়া হবে কিংস পার্টি। এই পার্টির ছাত্রদের প্রতি জনগণের আস্থা নেই। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে কেবল ছাত্ররা ছিল না। ছিল বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের অনুসারীরা। সুতরাং রাতারাতি পার্টি দাঁড় করিয়ে তারা নির্বাচনে জয়ী হবে সে আশা বাতুলতা। বাকি রইল জামাত। তারা ইতোমধ্যে সরকারের প্রায় প্রত্যেকটি সেক্টরে নিজেদের লোক বসিয়েছে। সরকারের সকল কর্মকাণ্ড মনিটরিং করছে। কাকে কোন জায়গা থেকে বাদ দিতে হবে, কাকে নিয়োগ দিতে হবে সবই তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে। ইউনূস এখানে 'শিখণ্ডি' মাত্র। কিন্তু জামাতও জানে কারও সঙ্গে অ্যালায়েন্স ছাড়া তারা এককভাবে নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না। যেটা পারবে; বর্তমান নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে দেশে একটা ইসলামিক এনার্কি সৃষ্টি করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা।

বাকি থাকল সেনাবাহিনী, যারা কার্যত ইউনূস সরকারের মেইন আর্টারি। ওই আর্টারি দিয়ে প্রবাহিত রক্ত ইউনূসের সরকার তথা হার্ট চালু রেখেছে। সেনাপ্রধান একাধিকবার বলেছেন- 'তাদের ক্ষমতা দখলের কোনো অভিপ্রায় নেই। তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দেখতে চায়'। এগুলো বাত কি বাত। সেনাপ্রধান এখন বাংলাদেশের রাজনীতির 'ডার্ক হর্স'। তিনি যে সব জেনে-বুঝেই এক একটি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন সেটা অনুমেয়। তিনি সর্বশেষ সাক্ষাতকারে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন, যেটা ইউনূস এবং তার ঠ্যাঙাড়ে মব ভায়োলেন্সকারীরা বলে না। সেনাপ্রধানের এই 'ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক' গড়ে তোলার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর গুঢ় দূরদর্শী চিন্তা। দেশে এখন যে নৈরাজ্য চলছে তা থামাতে ইউনূস যে পুরোপুরি ব্যর্থ সেটা দেশে-বিদেশে প্রমাণিত হয়েছে। প্রধান দুটো দলের প্রধান নেতৃত্ব দেশ ছাড়া। বাকি দলগুলোর ওপর জনগণের আস্থা নেই।

এমতাবস্থায় একমাত্র সেনাবাহিনীর ওপরই জনগণের আস্থা রয়েছে। তাই তিনি যতোই বলুন-'আমার মেয়াদকালে সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়াব না', তিনি সেটা রক্ষা করবেন এমন কোনও গ্যারান্টি তিনি নিজেও হয়ত দিতে পারবেন না। তার মানে অবস্তাদৃষ্টে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে অচিরেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা হাতে নিতে যাচ্ছে। আর তখনই অন্যতম শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতের কাছ থেকে তাদের সমর্থন পেতে হবে। সে কারণেই তিনি আগাম ভারতের সঙ্গে সকল সমস্যা মিটমাট করে নিতে চাইছেন। সাদা চোখে দেখলে যে কেউ বলে দিতে পারবেন এইমুহূর্তে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসলে জনগণ স্বাগত জানাবে। 'বিশৃঙ্খলতাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে হয়' এই মনোভাব দেশের জনগণের মধ্যে পাকাপোক্তভাবে রয়েছে।

নির্বাচন কবে হবে এমন প্রশ্ন রাজনীতিবিদদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে ইউনূস সরকার। এটাও কৌশল, কারণ জামাত এবং ছাত্ররা বলছে 'পুরো সংস্কার করে তার পর নির্বাচন'। বিএনপিসহ অন্যান্য দলগুলো বলছে-'না করলেই নয় এমন সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে'। অর্থাৎ নির্বাচন নিয়ে পক্ষগুলো ঐক্যমত্য হতে পারছে না। তাতে করে সুবিধে হচ্ছে ইউনূসের। তিনি বলবেন- 'আমরা নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দলগুলো তো নিজেরাই প্রস্তুত নয়'। অর্থাৎ তিনি আরও দীর্ঘ সময় নির্বাচনহীন কাটিয়ে দিতে পারবেন। ততদিনে জামাতের মূল এজেন্ডা-দেশে ইসলামিস্ট ক্যুদেতা ঘটানো। তারা জানে বাংলাদেশের জনগণের মতামতের কোনও মূল্য নেই। তাদের ওপর সিদ্ধান্ত বা অনুশাসন চাপিয়ে দিলে তারা ধীরে ধীরে সেটা মেনে নেয় এবং অভ্যস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে। এইরকম পরিস্থিতিই সেনাবাহিনী চায়। এবার মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেনাবাহিনী ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার পাওয়ার পরও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হাতে দমন করতে যায়নি! নাকি করেনি?

নির্বাচন না হওয়ার আরও কারণ। এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ মাঠে নেই। নেত্রী ছাড়া দলটি এখন ছন্নছাড়া। বিএনপি দীর্ঘদিন নির্বাচন বয়কট করে কর্মীদের এককাট্টা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কিংস পার্টি গঠিত হলে তাদের জনসমর্থন থাকবে না। এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগকে বাইরে রেখে নির্বাচন করলে সেটা প্রহসন হবে। জামাত নির্বাচন করলে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। ছাত্রদের সম্ভাব্য দল জনগণের কাছে জনপ্রিয় হতে চাইবে। তার জন্য সময় দরকার। সেই সময়ের মধ্যে জামাত সরকারের সর্বস্তরে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করবে, যেন নির্বাচন না করেই ক্ষমতা পরিচালনা করা যায়। এমন জটিল পরিস্থিতিতে সহসা নির্বাচন হবে সে আশা বাতুলতা।

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?

অ্যাট আ গ্লান্স-দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। জনগণ আতঙ্কিত। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নাভীঃশ্বাস। প্রধান দুটো দলের প্রধান চার নেতৃত্ব দেশ ছাড়া। সরকারে না থেকেও ছাত্ররা সরকারের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। চলছে খোলামেলা ঘুষ-দুর্নীতি-টাকা পাচার। অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভবনা শূন্য। প্রশাসন স্থবির। সিলেক্টিভ গ্রেফতার-জেল-জুলম ছাড়া পুলিশ আর কোনও দায়িত্ব পালন করছে না। সামগ্রিকভাবে ইউনূস পুরোপুরি সরকার চালাতে ব্যর্থ। ২০ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর ইউনূসের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেবেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। এই টালমাটাল অবস্থায় ইউনূস কী করবেন? অনুমান করা যায় তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। তার বয়স এবং চারপাশের অস্থিতিশীলতা তার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। তিনি কাদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে যাবেন? অনুমান করা কঠিন নয় যে তিনি সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা দিয়ে পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে চলে যাবেন। সেনাবাহিনী সামরিক আইন জারি করলে জাতিসংঘে পিস-কিপিং টিমে বাংলাদেশি সেনাদের নেওয়া হবে না। সেটা অর্থনৈতিকভাবে সেনাদের ক্ষতি। সে কারণেই তারা সামরিক আইন জারি করতে গড়িমশি করেছে। তাই বলে পুরো দেশ শাসনের সুযোগ পেয়ে তা পায়ে ঠেলে দেবে এমনটা ভাবার কারণ আছে কী?

মোটের ওপর আগামী এক দেড় বছরের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনও সুবাতাস নেই। এইসকল সম্ভাবনা আমরা যেমন ভাবছি, তেমনি ক্ষমতা দখল করতে চাওয়া স্বাধীনতাবিরোধীরাও ভাবছে। তাই এমন কিছু ঘটার আগে তারাও মরিয়া চেষ্টা করবে চূড়ান্ত নৈরাজ্য ঘটিয়ে তাদের অনুসারি সিভিল-মিলিটারির একাংশ নিয়ে রক্তপাতময় ক্যুদেতা ঘটাতে। জনগণের আশু দায়িত্ব হবে সেই সময়টাতে নিজেদের সংগঠিত রাখা। চোখ-কান খোলা রাখা এবং নিজেদের অস্তিত্বের জন্য দেশ-মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা, সর্বপরি নিজের ও পরিবারের জান-মাল রক্ষার জন্য সদা সতর্ক থাকা। দেশটা আকাশ থেকে পড়েনি। আমাদের পূর্বপুরুষদের সীমাহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া দেশ। একে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। ❐

ড. বি আর আম্বেদকর সংক্ষিপ্ত জীবন আলেখ্য

মজিবুর রহমান

ভারতের সংসদে সংবিধানের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ড. বি আর আম্বেদকরের ১৪.৪.১৮৯১ -৬.১২.১৯৫৬) অবমাননা করেছেন, এই অভিযোগে জোরদার বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অতীতের অনেক কথাই উঠে আসছে। এই বিতর্কের আবহে শাসকদল বিজেপি ও বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেস উভয়কেই অবশ্য আম্বেদকরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যাচ্ছে। উভয়েই আম্বেদকরের উত্তরাধিকার দাবি করছে। আম্বেদকর জাতীয় রাজনীতিতে চর্চার মধ্যে উঠে আসছেন। বর্তমান নিবন্ধে

আম্বেদকরের জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ও ঘটনার ওপর আলোকপাত করা হল যা তাঁর জীবনদর্শন ও সাফল্য-ব্যর্থতা বুঝতে সাহায্য করবে।

আম্বেদকরের জন্ম মুম্বাইয়ের অস্পৃশ্য মাহার সম্প্রদায়ে। তাঁর বাবা রামজি শকপাল ছিলেন একটি সামরিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আম্বেদকরের ঠাকুর্দা মালোজী শকপালও সামরিক বিভাগে চাকরি করতেন। আম্বেদকরের মা ভীমাবাঈয়ের বাবা-কাকারাও সামরিক বিভাগের আধিকারিক ছিলেন। সেই হিসেবে আম্বেদকর অস্পৃশ্য হলেও মোটামুটি একটা শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান। জন্মের সময় তাঁর নাম রাখা হয় ভীমরাও বা ভীম। বাপ-ঠাকুর্দার পদবি অনুযায়ী ভীমরাওয়ের পদবি 'শকপাল' হওয়ার কথা ছিল। তখনকার দিনে অস্পৃশ্যরা চরম সামাজিক অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতেন। পদবি দেখে অস্পৃশ্য চিহ্নিত করা সহজ হত। শকপাল হল অস্পৃশ্যদের মধ্যে অত্যন্ত চালু একটি পদবি। ভীমরাও শকপাল পদবি নিয়েই গভর্মেন্ট মিডল স্কুলে ভর্তি হন। ওই স্কুলের একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক ভীমরাওকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি ভীমরাওকে পদবির দ্বারা অস্পৃশ্য চিহ্নিত হয়ে নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে মুক্তি দিতে একটি কৌশল নেন। আমাদের দেশে বাসস্থানের নামকে ব্যক্তির নামের অংশ হিসেবে ব্যবহার করার রেওয়াজ রয়েছে। ভীমরাওয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল আম্বাবাদ। ওই মাস্টার মশাই আম্বাবাদ-এর সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে ভীমরাওয়ের পদবি বানিয়ে দেন। তাঁর নাম হয় ভীমরাও (মূল নাম) রামজি (বাবার নাম) আম্বেদকর (পদবি)। ১৯২৭ সালে আম্বেদকরের অনুগামীরা তাঁকে 'বাবাসাহেব' উপাধি দেন। সুভাষচন্দ্র বসুর 'নেতাজি' আর ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের 'বাবাসাহেব' ভক্তদের ভালোবাসা বহন করে। সুভাষচন্দ্র ও আম্বেদকরের মধ্যে আরও একটি মিল ছিল। তাঁরা দুজনেই গান্ধীজীর 'অবাধ্য' হওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হন এবং নতুন দল গঠন করেন। অন্যদিকে, আম্বেদকর দলিত সম্প্রদায়ের প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে কখনও সহমত হতে পারেননি। তিনি একাধিক দল গড়েছেন কিন্তু কখনও কংগ্রেসে যোগদান করেননি।

১৯৫১ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে এক বিশাল জনসভায় আম্বেদকর বলেন, 'দেশকে স্বাধীন করার কৃতিত্ব ও সম্মান প্রকৃত অর্থে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাপ্য, কংগ্রেসের নয়।' আম্বেদকর আজীবন কংগ্রেস ও গান্ধীজি ও পণ্ডিত নেহরুর বিরোধী ছিলেন। যদিও তাঁরা অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়ে আম্বেদকরকে স্বাধীনতার পর গণ পরিষদে জিতিয়ে এনে আইন মন্ত্রী ও সংবিধান খসরা কমিটির সভাপতি করেন। ১৯৫১ সালের প্রথম নির্বাচনের। প্রাক্কালে আম্বেদকর নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও মুম্বাইয়ের একটি আসনে লড়াই করে কংগ্রেসের কাছে পরাস্ত হন। তিনি এই সময় ক্রোধের বশে সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে কংগ্রেসকে আবারও আক্রমণ শুরু করেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র আম্বেদকর সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তাঁর ' ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ' গ্রন্থে (রচনাবলীর ২য় খণ্ড) লিখেছেন 'প্রয়োজন দেখা দিলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রাতারাতি নেতা তৈরী করেন এবং ব্রিটিশ পত্রিকাগুলির সৌজন্যে তাঁদের নাম সারা বিশ্বে তাঁরা প্রচার করে থাকেন। যখন ১৯১৯ এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বিবেচনাধীন ছিল তখন তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করবার জন্য মাদ্রাজের স্বর্গত ডা. টি.এম. নায়ার কে লন্ডনে নেতা দাঁড় করানো হয়। ১৯৩০ সালে ও তার পরে সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ডা. আম্বেদকরের উপর নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন কারণ জাতীয়তাবাদী নেতাদের অসুবিধায় ফেলার জন্য তাঁর সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।(ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -- ১৮)

আম্বেদকরের পিতা-মাতার ১৪টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু নয়জনেরই অকালমৃত্যু হয়। আম্বেদকর ছিলেন কনিষ্ঠতম। আম্বেদকরের মায়ের মৃত্যু পর তাঁর বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। সৎমায়ের সঙ্গে আম্বেদকরের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তবে তিনি পিতার দেখভাল করতেন এবং সৎমায়ের সৎকার সহ আনুষঙ্গিক কাজ দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। আম্বেদকর সতেরো বছর বয়সে নয় বছর বয়েসী রামি বা রমাবাঈয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেন কিন্তু চারজনেরই অকাল মৃত্যু হয়। একমাত্র জীবিত সন্তান যশোবন্ত কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে ব্যর্থ হন। ১৯৩৫ সালে রমাবাঈয়ের মৃত্যু হয়। ১৯৪৮ সালে সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী আম্বেদকর ব্রাহ্মণ কন্যা ডাঃ সারদা কবীরকে বিবাহ করেন। পরে তিনি 'সারদা' থেকে 'সবিতা' হন। তিনি মুম্বাই গভর্মেন্ট হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন যেখানে আম্বেদকরকে একাধিকবার রোগী হিসেবে ভর্তি হতে হয়েছিল। সবিতাদেবীর সঙ্গে বিবাহকে আম্বেদকরের পুত্র এবং অনুগামীরা সমর্থন করেননি। আম্বেদকরের প্রয়াণের পর সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে সবিতাদেবী ও যশোবন্তের মধ্যে দীর্ঘদিন আইনি লড়াই চলেছিল।

আম্বেদকর একজন মেধাবী, মনোযোগী ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। তিনি মুম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজ থেকে ১৯১০ সালে আই এ পাস করেন এবং বরোদার মহারাজার কাছ থেকে বৃত্তি পান। ১৯১২ সালে মুম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বি এ পাস করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে 'প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য' বিষয়ে একটি থিসিস লিখে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর 'ভারতের জাতীয় লভ্যাংশ-- একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি গবেষণা সন্দর্ভ উপস্থাপন করে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর বৃত্তির শর্তানুসারে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বরোদার মহারাজার সামরিক সচিব পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। কিন্তু অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক বলে তিনি নানা লাঞ্ছনার শিকার হন এবং নভেম্বরেই চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স-এ

অর্থনীতির অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং মার্চ, ১৯২০ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল থাকেন। এরপর আরও পড়াশোনা করার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ অর্থনীতি ও ডিগ্রি ইন-এ আইন নিয়ে ভর্তি হন। ১৯২১ সালে 'বৃটিশ ভারতে পুঁজির প্রদেশভিত্তিক বন্টন' বিষয়ে থিসিসের জন্য এম এস সি ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যারিস্টার অ্যাট ল পাস করেন ১৯২২ সালে এবং ১৯২৩ সালে 'টাকার সমস্যা' বিষয়ক থিসিসের জন্য ডি এস সি ডিগ্রিলাভ করেন। ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে মুম্বাইয়ের একটি কলেজে বাণিজ্যিক আইন বিষয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং মার্চ, ১৯২৮ পর্যন্ত কাজ করেন। এরপর জুন মাসে মুম্বাই গভর্মেন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে এখান থেকে বিদায় নেন। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ফিরে আসেন এবং ১৯৩৮ সালের জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর আর কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করেননি। তবে অনিয়মিত ভাবে ব্যারিস্টারি চালিয়ে যান।

আম্বেদকর লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণা পত্র লেখা ছাড়াও তিনি তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বিষয়াদি নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯২০ সালে তিনি মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকা 'মূক নায়ক' প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালে এটি বন্ধ করে 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে আরেকটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে মাসিক পত্রিকা 'সমতা'র সূচনা হয়। ১৯২৯ সালে পাক্ষিক পত্রিকা 'জনতা'র যাত্রা শুরু হয়। আম্বেদকরের লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক বা পুস্তিকার নাম হল-- 'ভারতে জাতিভেদ প্রথা', 'ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সমাধান', 'জাতপাত প্রথার বিলুপ্তি', 'সংঘ বনাম স্বাধীনতা', 'পাকিস্তান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা', 'তফসিলি জাতিসমূহের সমস্যা', 'রানাডে, গান্ধী এবং জিন্নাহ', 'অস্পৃশ্যদের জন্য কংগ্রেস ও গান্ধী কী করেছে?', 'সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা ও তার সমাধানের একটি উপায়', 'শূদ্র কারা?', 'রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়', 'অস্পৃশ্য কারা?', 'ভাষাভিত্তিক প্রদেশ হিসেবে মহারাষ্ট্র', 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমতের ভবিষ্যৎ', 'হিন্দু নারীদের উত্থান ও পতনের জন্য দায়ী কারা?', 'বুদ্ধ অথবা কার্ল মার্কস' ইত্যাদি। মহারাষ্ট্র সরকার ১০ খণ্ডে আম্বেদকর রচনাবলী প্রকাশ করেছে।

আম্বেদকর অনুন্নত শ্রেণির উন্নয়নের জন্য ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে গঠন করেন 'বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা'। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে ধ্বনি তোলা হয়-- শিক্ষা, আন্দোলন, সংগঠন। এর মাধ্যমে বলতে চাওয়া হয় যে, অনুন্নত শ্রেণির মানুষ শিক্ষা গ্রহন করে সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলনে সামিল হলে তবেই তাঁদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। আম্বেদকর ১৯২৫ সালে মুম্বাই বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে দু'দিন ধরে সমাবেশ ও সভা করার পর মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলায় অবস্থিত মাহাদ পৌরসভার চৌদার পুকুরে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে আম্বেদকর দশ হাজার দলিত অনুগামী সহ জলপান করেন। আম্বেদকরের অনুগামীদের সঙ্গে স্থানীয় বর্ণহিন্দুদের মারপিট হয় এবং ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতে আম্বেদকরের জয় হয়। ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় মাহাদে মনুস্মৃতি দহন কর্মসূচি পালন করা হয়। দহন ভূমিতে পোস্টারে লেখা হয়-- অস্পৃশ্যতা ধ্বংস হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদকে কবর দাও, জন্মের ওপর ভিত্তি করে চতুর্বর্ণ মানি না ইত্যাদি। মনুস্মৃতির একটা একটা করে পাতা ছিঁড়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। মনুস্মৃতি দহন আম্বেদকরের একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল। মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এটি অন্যতম হিন্দু ধর্মশাস্ত্র। এটি জাতি ও লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি। মনুস্মৃতি শূদ্রদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেয় না। মনুস্মৃতির বিধানে শূদ্রের শিক্ষার অধিকার নেই, সম্পত্তির অধিকার নেই, ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার অধিকার নেই। শূদ্রের কাজ শুধু মুখ বুজে উচ্চবর্ণের সেবা করা, কোনও প্রতিদানের আশা না করে। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ পাঠ করা এমনকি শ্রবণ করাও শূদ্রদের জন্য কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মনুসংহিতা নারীর অধিকার চূড়ান্তভাবে খর্ব করে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অধিকার অস্বীকার করা হয়। রূপচর্চা, শিশু পালন ও ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়নের মধ্যে নারীর ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়। পুরুষদের বহুবিবাহের অনুমতি দেয় কিন্তু অকাল বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করে। সবমিলিয়ে বলা যায়, শূদ্র ও নারীকে চরম অমর্যাদা ও বৈষম্যের সমাসনে বসিয়েছে মনুসংহিতা।

আম্বেদকর অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালের গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড) ঘোষণা করেন। এতে প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের পাশাপাশি নির্যাতিত শ্রেণি তথা দলিত সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা নির্বাচনের দাবি স্বীকৃত হয়। এর অর্থ হল, কিছু আসন থাকবে সাধারণ (জেনারেল) যেগুলোতে (উচ্চবর্ণের) হিন্দু সহ সকল ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভোটার একটি করে ভোট দেবেন এবং একজন প্রার্থী জয়লাভ করবেন। কিন্তু কিছু আসন হবে সংরক্ষিত (রিজার্ভড) যেগুলোতে যেকোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের সঙ্গে মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান অথবা দলিত প্রার্থীরা থাকবেন। জয়লাভ করবেন দু'জন। একজন সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রার্থী এবং একজন সংরক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রার্থী। অসংরক্ষিত আসনটির জন্য সকলেই ভোট দিতে পারবেন। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধুমাত্র ওই সম্প্রদায়ের ভোটাররাই ভোট দিতে পারবেন। কংগ্রেস মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের জন্য পৃথক

নির্বাচনের দাবি মেনে নিলেও দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থায় তীব্র আপত্তি জানায়।

মহাত্মা গান্ধী তখন মহারাষ্ট্রের পুনেতে অবস্থিত যারবেদা কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আম্বেদকর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আলাপ আলোচনার পর সেপ্টেম্বর মাসে 'পুণা চুক্তি' গৃহীত হয়। এই চুক্তি অনুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংযুক্ত নির্বাচনী ক্ষেত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে সাধারণ আসনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত থাকবে। এগুলোতে প্রার্থীরা সকলেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের হবেন কিন্তু সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভোটাররাই ভোট দেবেন। গোটা দেশে এমন সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা স্থির করা হয় ১৪৮টি। এর মধ্যে বাংলার আসন ছিল ৩০টি।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে বাংলায় প্রায় ৯০টি বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠীকে অনুন্নত শ্রেণি হিসেবে ঘোষণা করা হয়-- বাগদী, বাহেলিয়া, বাইতি, বাউরি, বেদিয়া, ভাটিয়া, ভুঁইমালি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চামার, ধেনুয়া, ধোবা, ডোম, গারো, খাসি, হাড়ি, হো, জেলিয়া, কৈবর্ত, ঝালো, মালো, কাদার, খারো, কালোয়ার, কান, কাঁষ, কান্দ্রা, কেওরা, কাপালি, কাপুরিয়া, কারেঙ্গা, কস্তা, কউর, খণ্ডাইত, খাতিক, কীবক, কোচ, কোনাই, কোনওয়ার, কেরা, কোটাল, লোধা, লোহার, মাহার, মালি, মাল, মল্ল, মেছ, মেথর, মুচি, মুন্ডা, মুসাহার, নাগর, নাগেসিয়া, নৈয়া, নমঃশূদ্র, নাথ, নুজিয়া, ওঁরাও, পালিয়া, পান, পাশি, পাটনি, পোদ, পুস্তরী, রাভা, রাজবংশী, রাজোয়ার, সাঁওতাল, সুকলি, শুড়ি, তুরী ইত্যাদি। এরাই প্রাথমিকভাবে সিডিউলড কাস্ট বা তফসিলি জাতি বলে চিহ্নিত হয়। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে 'ভারত শাসন আইন' পাস করে তাতে তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষণ স্বীকৃত হয়। ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১১০৮টি জনগোষ্ঠী তফসিলি জাতি ও ৭৪২টি জনগোষ্ঠীকে তফসিলি উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আম্বেদকর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর দল মুম্বাই আইনসভার নির্বাচনে ১৫টি আসনে জয়লাভ করে। তিনি নিজেও নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি গড়ে তোলেন তফসিলি জাতি ফেডারেশন। জুলাই মাসে তাঁকে ভাইসরয়ের কর্মসমিতিতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় যা তিনি জুন, ১৯৪৬ পর্যন্ত পালন করেন। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালেই প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুম্বাই আইন পরিষদে তফসিলি জাতি ফেডারেশন সদস্য খুব কম থাকায় আম্বেদকরের সেখান থেকে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাই তাঁকে বাংলা থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের জুন মাসে বাংলার আইনসভায় বঙ্গ বিভাজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে গণপরিষদে (পশ্চিম) বাংলার প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস পায় এবং আম্বেদকরের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। তখন কংগ্রেস মুম্বাই বিধানসভায় তাদের সদস্য ড. এম আর জয়াকারের পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থান থেকে আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। ২৯শে আগস্ট, ১৯৪৭ গণপরিষদ সাত সদস্য বিশিষ্ট খসড়া (ড্রাফটিং) কমিটি গঠন করে যার সভাপতি নিযুক্ত হন আম্বেদকর। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট সংবিধানের খসড়া জমা করা হয়। গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা শুরু হয় ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪৮। ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ সংবিধান গৃহীত হয় এবং ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০ কার্যকর হয়। আইনমন্ত্রী হিসেবে আম্বেদকর ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংসদে হিন্দু কোড বিল পেশ করেন। এই বিলে হিন্দু সমাজে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সংস্কারের সংস্থান রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ কংগ্রেসের উচ্চবর্ণের নেতৃবৃন্দ বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। অস্পৃশ্য মাহার আম্বেদকর হিন্দুর ধর্মীয় বিধান সংস্কার করবেন, এটা অনেক গোঁড়া হিন্দু মেনে নিতে পারেননি। প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়। পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিলটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। আম্বেদকর তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমের এমন করুণ পরিণতিতে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন এবং ১১ই অক্টোবর মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। পদত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির সমালোচনা করেন। তাঁর পরামর্শ ছিল, কাশ্মীরের মুসলমান প্রধান অংশ চলে যাক পাকিস্তানে এবং হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ প্রধান অংশ যুক্ত হোক ভারতের সঙ্গে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে। আম্বেদকর মুম্বাইয়ের একটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে তফসিলি জাতি ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীর নিকট পরাজিত হন। কয়েক দিন পর মার্চ মাসের শেষ দিকে মুম্বাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট ১৫টি রাজ্যসভা আসনের একটিতে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে সংসদের অধিবেশনে এক বক্তৃতায় আম্বেদকর বলেন, "আমার বন্ধুরা বলেন আমিই সংবিধান রচনা করেছি। কিন্তু আজ একথা আমি বলতে চাই যে, আমিই প্রথম ব্যক্তি সেটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। এই সংবিধান আমি চাই না।" তিনি নিজেকে 'ভাড়াটিয়া সংবিধান লেখক' বলেছিলেন। রাজ্যসভার সদস্য থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালে মুম্বাইয়ের একটি লোকসভার উপনির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরাজিত হন।

আম্বেদকর ও তাঁর স্ত্রী সবিতা ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।

দীক্ষাভূমি জনসমুদ্রের আকার ধারণ করে। সমবেত জনতা আম্বেদকরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ১৪ থেকে ১৬ অক্টোবরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ নিম্নবর্ণের হিন্দু বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পাঁচ-ছয় বছর আগে থেকেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ উৎসব ও অনুষ্ঠানে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি বিজড়িত অশোক চক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান পায় এবং সারনাথের অশোক স্তম্ভের চূড়ার জোড়া সিংহ মূর্তি ভারত রাষ্ট্রের প্রতীক রূপে গৃহীত হয়। তিনি ১৯৫৩ সালের জুন মাসে স্থাপন করেন মুম্বাই সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধের পূর্বনাম) কলেজ অব কমার্স। আম্বেদকরের হিন্দুধর্ম ত্যাগ করার চিন্তাভাবনা দুই-আড়াই দশক আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯২৯ সালে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "অস্পৃশ্যরা যেন এমন এক ধর্ম গ্রহণ করে যা তাদের সমান অধিকার দেবে অন্য মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করার, একসাথে খাওয়ার।" ১৯৩৫ সালে মহারাষ্ট্রের ইয়োলায় দলিত সমাজের দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। নিজের ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে আম্বেদকর বলেন যে, তিনি জন্ম নিয়েছেন অস্পৃশ্য হিন্দু হিসেবে, এর অন্যথা তাঁর এক্তিয়ারে ছিল না। তবে তিনি হিন্দু হিসেবে মৃত্যু বরণ করবেন না। তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, অস্পৃশ্য শধটির জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে। সে সময় যে সব বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেননি তাঁদেরই অস্পৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়। পরে অবশ্য হিন্দুধর্ম গৌতম বুদ্ধকে দশম অবতারের একজন হিসেবে মেনে নেয়। আম্বেদকরের মতে সে যুগের নিষ্ঠাবান বৌদ্ধরাই বর্তমান ভারতে অস্পৃশ্য হয়ে আছেন।

আম্বেদকর তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হন। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সংবিধান রচনার কৃতিত্বের জন্য আম্বেদকরকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। প্রখ্যাত আইরিশ নাট্যকার, বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক কর্মী জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) বলেছিলেন, "ড. আম্বেদকরের বর্তমান ও সুদূর ভবিষ্যতকে দেখবার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল।" বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) বলেছিলেন, " পণ্ডিতদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু আম্বেদকরের মতো জ্ঞানী ও মহান শিক্ষক জগতে খুবই কম।" প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক, নাট্যকার ও পাবলিক স্পিকার জন বেভারলি নিকোলস (১৮৯৮-১৯৮৩) মন্তব্য করেন, "ড. আম্বেদকর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছয়জন মেধাবী পণ্ডিতদের একজন।"

আম্বেদকরের আদর্শকে সামনে রেখে কাঁশিরাম ১৯৮৪ সালে উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টি (বি এস পি) গঠন করেন। ১৯৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের সরকার আম্বেদকরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদান করে। দলিত সমাজ আম্বেদকরকে ভগবানের দৃষ্টিতে দেখে। অনেক সংগঠন ১৪ই অক্টোবর ধর্মান্তর দিবস ও ২৫শে ডিসেম্বর মনুস্মৃতি দহন দিবস উদযাপন করে। ভারতের সংবিধানের আলোচনা তাঁকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন আম্বেদকর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে কখনও হারিয়ে যাবেন না। ❐

(ঋণ স্বীকার ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকর/সুশান্তকুমার সাহিত্যরত্ন, উইকিপিডিয়া)

দুই ‘‘ কার ’’-এর চেলাদের ঠেলাঠেলি
হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত ‘ র
কি যায় আসে ?

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

দুই ‘কার’ বলতে বোঝাতে চাইছি মহামান্য ‘সাভারকার’ ‘ ও মহামান্য ‘আম্বেদকারকে’-কে, যাঁদের জন্ম ব্রিটিশ ভারতে , মৃত্যু স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে। আর ‘ হাসিম ‘ বোলতে বুঝিয়েছি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গ দেশের কৃষক’ প্রবন্ধের অন্যতম এক চরিত্রকে; ক্ষুরামাক্ষ্ম হোল ঐ লেখকের রচনাংশের আর একজন খেটে খাওয়া মানুষ।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষসহ গোটা পৃথিবী আজ মহাসংকটে। ক্ষুধা--দারিদ্র্য--বেকারী--অপুষ্টি, অশিক্ষা--দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি হোল আকাশচুম্বী। সেসব সমাধানের দিকে কোন নজর প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের নেই। কেবল ধর্ম আর জাতপাতের বিষবাষ্প ছড়িয়ে, সাধারণ মেহনতী মানুষকে বিভ্রান্ত করে, রক্তের বন্যায় মেদিনীকে সিক্ত করার অপপ্রয়াস। গঙ্গা--যমুনা--কাবেরীর তীর থেকে শুরু করে, পদ্মা--মেঘনা--সিন্ধু--কাবুল--জর্ডান--ইরাবতীর কূল, সমস্ত ক্ষেত্র সম্পর্কেই এই কথা খাটে।

এই প্রেক্ষাপটে দুই ‘ কার ‘ অর্থাৎ সাভারকার ও আম্বেদকারের নাম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমাদের পার্লামেন্টে সরকার ও সরকার বিরোধীদের মধ্যে এই দু-জনকে নিয়ে ক’দিন ধরে ব্যাপক চাপান উতোর চলছে। এই চাপান উতোরের রেশ সংসদ ভবনের সিঁড়ি পেরিয়ে রাজপথে এসে আছড়ে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থের নিরীখে, বঙ্কিমের হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত, রামধন পোদদের স্বার্থের দৃষ্টিকোণে, কিংবা শরৎচন্দ্রের গফুর জোলা--আমিনা--অভাগী--কাঙালী চরণের জীবনের আলোকে, মুন্সী প্রেমচাঁদের সদ্‌গতিরদুঃখীরকষ্টিপাথরে,বা জসিমউদ্দিনের ক্ষুন্নকসী কাঁথার মাঠক্ষ্ম--এর রূপাই ও সাজুর দৃষ্টিতে, অথবা তারাশঙ্করের ক্ষ্মঅগ্রদানীক্ষ্মর পূর্ণ চক্রবর্তীর জীবনের পটভূমিকায় আমাদের জাতীয় জীবনে সাভারকার--আম্বেদকারের প্রাসঙ্গিকতার উপর আলোচনা করছি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পলাশীর প্রান্তরে মীরমদন-মোহনলালের আত্মবলিদান থেকে শুরু করে মীরজাফরের কারাগারে সিরাজউদ্‌দৌলা হত্যা, ওয়াহাবী আন্দোলনে তিতুমীর, সাঁওতাল বিদ্রোহে কানু সিঁধু, মুণ্ডা বিদ্রোহে বীরসা মুণ্ডা, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে মঙ্গল পাণ্ডে, গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-বিনয়-বাদল দীনেশ, ভগৎ সিং, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা, তেভাগা আন্দোলনে অহল্যা-বাতাসী-জানা অজানা বহু বীর, বহু বীরাঙ্গণা শহীদরা মৃত্যুবরণ করেছেন।

এর পাশাপাশি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহেরু, সীমান্ত গান্ধী খান আধুল গফুর খান, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,এস এ ডাঙ্গে, মুজফফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ি প্রমুখরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একথা ঠিক যে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনায় গান্ধীজীর পদ্ধতি নিয়ে অনেকের অনেক ক্ষোভ আছে। বিশেষকরে তথাকথিত হিংসা--অহিংসার প্রশ্ন তুলে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় চৌরিচৌরায় কৃষক অভ্যুত্থান ও কিছু পুলিশ কর্মী নিহত হওয়ায় তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।এই ধরণের পদ্ধতি গ্রহণের ফলে গান্ধীজীর দোদুল্যমানতা ধরা পড়ে। কিন্তু, গান্ধীজীর এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনটি জিনিষ স্বীকার করতেই হবে

(১) গান্ধীজী ছিলেন পরাধীন ভারতে "Serious Politics" বা গণমুখী রাজনীতির জনক। তাঁর আগে আমাদের দেশে পূর্ব্বোল্লিখিত সংগ্রামগুলি হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে ঐ সব আন্দোলনগুলি ছিল শত শহীদের রক্তাঞ্জলির গৌরবে সমুজ্জ্বল। কিন্তু সেগুলির কোন সর্ব্বভারতীয় চরিত্র ছিল না। সেগুলি ছিল আঞ্চলিক। গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনগুলিই আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে উত্তাল করে তুলেছিল। কমরেড লেনিন তাই তাঁকে এশিয়ার মহানতম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী বলে অভিহিত করেন।

(২) তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য অকুতোভয় যোদ্ধা। এর জন্য তাঁকে হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

(৩) তিনি ' সর্বদয় ' অর্থাৎ সবার কল্যাণের কথা বলেছেন। ধর্ম ভিত্তিক ও জাতপাত ভিত্তিক বিভাজনের তীব্র বিরোধীতা করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে এই ধরনের বিভাজন আমাদের জনগণের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করবে এবং তাতে লাভবান হবে ভারতীয় জনগণের শত্রুরা।

যে দুই " কার "-এর প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের সংসদের ভিতরে ও বাহিরে সরকার ও সরকার বিরোধীদের মধ্যে চাপান উতোর চলছে, সেই দুই ক্ষ্ম কার ক্ষ্ম উল্লিখিত শহীদদের পাশে কিংবা মহাত্মা গান্ধীসহ উল্লিখিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্যই নন। কারণ, স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বোক্ত বা অন্যান্য আরও শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার সংগ্রামে। আর গান্ধীজীসহ উল্লিখিত জাতীয় নেতারা গ্রেপ্তার বরণসহ অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন ব্রিটিশ শাসকদের হাতে দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে। কিন্তু সাভারকার ও আম্বেদকার ? এরা উভয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত ছিলেন।

প্রথমে সাভারকারের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক। যে দেশে বিবেকানন্দের মত মানুষ শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের সহনশীলতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার উপর বক্তৃতা করে সারা দুনিয়াকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন, যে দেশে কাশ্মীরের মাটিতে ঝিলাম নদীর তীরে এক মুসলিম মাঝির কিশোরী কন্যাকে ক্ষ্মভারত মাতাক্ষ্ম জ্ঞানে যাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তিনি তার পূজো করেছিলেন এবং সেই থেকেই শারদীয়া মহাঅষ্টমীতে এই দেশে কুমারী পূজোর চল করেছিলেন, সেই দেশে উগ্র হিন্দু মৌলবাদের বিষ বৃক্ষের বীজ যাঁরা আধুনিক যুগে ছড়িয়েছিলেন, সাভারকার তাদের ভগীরথ।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি জীবন খাতার পাতায় গল্প লেখাটা শুরু করেছিলেন ভালোভাবে, কিন্তু মাঝ পথ থেকে সেটার বাঁক নিল কুৎসিৎ দিকে। অর্থাৎ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই তিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু জেলবন্দী হয়ে বন্দী দশাতেই তিনি মত পাল্টে ফেলে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে মুচলেখা দিয়ে তাদের অনুগ্রহে তিনি মুক্ত হন। তাহলে বুঝুন। যেখানে ক্ষুদিরাম-সূর্য্যসেনরা প্রাণ দিয়েছেন ইংরেজদের হাতে, সেখানে সাভারকার ইংরেজ শাসনকে বিরোধীতা করার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে ছাড়া পেয়েছেন জেল থেকে। ইংরেজ প্রভুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে মুক্ত হন। আন্দামানে সেলুলার জেলে ও কারা ভোগের সময় তিনি আবেগতাড়িত ভাষায় ইংরেজ সাহেবদেরকে লেখেন যে তাঁর চৈতন্য হয়েছে। তিনি আর জীবনে কখনোই তাদের বিরোধীতা করবেন না। বরং চিরদিন তাদের অনুগত হয়ে থাকবেন। এই চিঠির পর ১৯২১ সালে তিনি আন্দামান সেলুলার জেল থেকে ছাড়া পান। পরে দুই বছর তিনি রত্নগিরিতে গৃহ অন্তরীণ থেকে ছাড়া পান। অবশিষ্ট জীবন তিনি ব্রিটিশদের আস্থা ভাজন হয়ে কাজ করেছেন। তিনি দেশের উত্তাল গণ আন্দোলনগুলি থেকে অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, সবকিছুর থেকে নিজেকে শুধু সরিয়েই রাখেননি, তিনি সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশদের আস্থাভাজন হিসাবে কাজ করে গেছেন এবং উগ্র হিন্দু মৌলবাদের তত্ত্ব প্রচার করে গেছেন।

এই সময়কালে মাস্টারদা সূর্য্য সেন থেকে শুরু করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ কত বীর বীরাঙ্গনারা আত্ম বলিদান করেছেন। সাভারকার এই শহীদদের স্বপক্ষে একটি কথাও বলেননি। বরং ইংরেজদের সমস্ত দমনপীড়নকে সমর্থন করে গেছেন।

আর আম্বেদকার ? সারাটা জীবন তিনি মুসলিম লীগ তথা জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বহুত্ববাদী দেশে, অশোক--আকবর--দারা শুকো -- কবীর চৈতন্য , রবীন্দ্র নাথের দেশে, ধর্ম ও জাতপাতের তাস খেলে গেছেন। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে পৃথিবীতে কি এমন

কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে যাদের মধ্যে কিছু লোক ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়নি এবং সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করেনি ? কি হিন্দু ধর্ম, কি খ্রীষ্ট ধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম, কি ইসলাম ধর্ম, সব ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে একথা খাটে। আবার সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ চিন্তার মানুষরা এইসব বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়েছেন। আমরা যদি ইসলামের কথা ধরি, তাহলে দেখা যাবে যে আকবর, দারা শুকো, আমাদের দেশ ভারতে, তুরস্কে বরেণ্য জননেতা কামাল আতাতুর্ক, কবি নাজিম হিকমৎ, মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আধেল নাসের, উলেমাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং তাদের সৃষ্ট শেখ-সৈয়দ-গাজী, ইত্যাদি জাতিগত স্তর বিন্যাসের ছুৎমার্গতার বিরুদ্ধে লড়েছেন।

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে মুন্সী প্রেমচাঁদ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ মানুষরা যাঁরা জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ কায়স্থ, তাঁরা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তাঁরা হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত, রামধন পোদ, গফুর জোলা, দুঃখী, অভাগীদের কথা লিখেছেন। আবার জ্যোতিরাদিত্য ফুলে, সাবিত্রী বাই ফুলে প্রমুখ মহান সন্তানরা বর্ণগত শোষণের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কিন্তু এঁরা কেউ সংরক্ষণের কথাই বলেননি, ধর্মত্যাগ করেননি, জাতিগত বিদ্বেষ ছড়াননি। কিন্তু

আম্বেদকার নিজেকে একজন ক্ষুন ভুতো ন ভবিষ্যতিক্ষু এমন একজন হরিজন নেতা বলে মনে করতেন এবং তাঁর লেখার মূল সুর যতনা বর্ণশোষণের অবসান ঘটানোর প্রয়াস, ততোধিক মানুষে মানুষে ঘৃণার বাতাবরণ তৈরী করা। তিনি হিন্দুদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতে পাননি। তাই তিনি বৌদ্ধ হলেন। সেটা তাঁর অভিরুচি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বজা ধরে আজ মুসলিম হবার অপরাধে মায়ানমারে বৌদ্ধজঙ্গীরা রোহিঙ্গাদের যেভাবে হত্যা করছে, তা তো সভ্যতার লজ্জা। খৃষ্টান ধর্মে দেখা যায় যে মার্টিন লুথার প্রমুখ সমাজ সেবীরা ক্যাথলিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

এরপর বলি স্বাধীনতা সংগ্রামে আম্বেদকারের ভূমিকা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ১৯৩২ সালে লণ্ডন গোলটেবিল বেঠকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলার আগে গান্ধীজী সমর্থন চান জিন্না ও আম্বেদকারের। কিন্তু তাঁরা শর্ত দেন যে যদি গান্ধীজী মুসলিম ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ও বিশেষ সংরক্ষণের দাবী মানেন, তাহলে তাঁরা গান্ধীজীর স্বাধীনতার দাবীকে মানবেন। কিন্তু গান্ধীজী ধর্ম ও জাত -.এর ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনকে সর্বনাশা অভিহিত করে সর্ব্বোদয় বা সবার কল্যাণের কথা বললেন। ফলে গোল টেবিল বেঠক ভেস্তে গেল। প্রকাশ থাকে যে বিবেকানন্দ থেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কিংবা সাবিত্রী বাই ফুলে বা জ্যোতিবা ফুলে, জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ ও সমমর্যাদার কথা বলেছেন। কেউই কিন্তু ধর্মভিত্তিক বা জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণের কথা বলেননি। আম্বেদকার সেটার উপর জোর দিয়েছেন জিন্নাকে সঙ্গে নিয়ে এবং এইভাবে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে বিষ ঢেলেছেন।

সর্ব্বোপরি ১৯৪২-১৯৪৬, তিনি ব্রিটিশ ভারতের গভরনর জেনারেলের কাউন্সিলসভ্য ছিলেন এবং সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নীপীড়নাত্মক নীতিকে কার্যকর করার দায় তাঁর উপর বর্তায়। এই সময়কালে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরাকে গুলি করে হত্যা করা, তাম্রলিপ্ত সরকার গুঁড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা হয়। হিন্দু--মুসলিম সম্প্রীতিকে ভাঙ্গতে ১৯৪৬-এর "The great Calcutta killing"-এর Blueprint করা হয়।উল্লেখ করা যায় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোনও আন্দোলনকে আম্বেদকর কোনওদিন সমর্থন করেন নি। তিনি নীরবে ইংরেজদের নির্দেশ পালন করে মুক্তি আন্দোলন বিরোধী কাজ করেছিলেন। এসবের ফলশ্রুতিতে অনুন্নত সম্প্রদায়সহ সব সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে আম্বেদকরের দলকে মহারাষ্ট্রে একটি আসনেও জেতাননি। তিনি পূর্ব বাংলার খুলনা সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগ নেতা যোগেন মন্ডলের সমর্থনে যেতেন। মুসলিম লীগ সংবিধান যাতে রচিত না হয় তার জন্য গণ পরিষদ বয়কট করে। আম্বেদকর লীগকে সমর্থন করেন। কংগ্রেসের প্রবল চাপে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল গণ পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। মু. লীগ ও আম্বেদকারকে বাদ দিয়ে গণ পরিষদ কাজ শুরু করে। ১৯৪৬ এর ১৩.ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সংবিধানের লক্ষ্য সম্পর্কিত বক্তৃতা ও দলিল পেশ করেন। এটিই আমাদের সংবিধানের Pre - amble। দেশ ভাগের পর আম্বেদকার আর গণ পরিষদে থাকতে পারলেন না , কেননা তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র চলে গেলো পূর্ব বাংলায়। তখন গান্ধীজির নির্দেশে কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করে মহারাষ্ট্রের একটি সংরক্ষিত আসন থেকে জিতিয়ে আনে ও তিনি গণ পরিষদের সদস্য হন। শুধু তাই নয় গান্ধীজির নির্দেশে নেহরু তাঁকে তাঁর মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী করেন ও সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান করেন। চিরকাল আম্বেদকার কংগ্রেস , মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরুর বিরোধিতা করা সত্বেও এই নেতৃবৃন্দ আম্বেদকারের প্রতি এই উদারতা প্রদর্শন করেন।

১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর অর্থাৎ গণ পরিষদের অন্তিম অধিবেশনের আগের দিন আম্বেদকর এক মর্মস্পর্শী ভাষণে সংবিধান খসড়া কমিটির কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। তিনি ধন্যবাদ জানান খসড়া কমিটির সকল সদস্যকে, ধন্যবাদ জানান সাহায্যকারী কর্মীদের। এবং তিনি ধন্যবাদ জানালেন সেই পার্টিকে (পড়ুন কংগ্রেস) , তিনি সারা জীবন ধরে যে পার্টির বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি বলেন পরিষদ কক্ষের ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেসের নেতারা শান্তভাবে কাজ না করে গেলে তাঁর পক্ষে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা বার করে আনা সম্ভব হত না। কংগ্রেস পার্টির এই শৃঙ্খলার সুবাদেই খসড়া কমিটির পক্ষে প্রত্যেকটি ধারা ও প্রত্যেকটি সংশোধনীর পরিণতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে খসড়া সংবিধানকে গণ পরিষদে ঠিক মতন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। (গাঁধী উত্তর ভারত- রামচন্দ্র গুহ ,পৃষ্ঠা -- ১০৭- ১০৮)

প্রসঙ্গতঃ উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে ডঃ রাধাকৃষ্ণানের বক্তৃতার কিছু কথা মনে পড়ে যায় ''গরীব মানুষ যারা খেতে পায় না, কাজ পায় না, যাদের জীবন দারিদ্র্যের যাতনায় ক্ষত বিক্ষত, তারা সংবিধান বা তার আইন নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে না।'' এই একই সুরে আমরা বলি, হাসিম শেখ--রামা কৈবর্তের মত নিষ্পেষিত ঘরের মানুষরা যারা জাত চায় না, চায় ভাত, যারা ধর্ম চায় না চায় কর্ম, তারা আম্বেদকার--সাভারকারের মত মানুষকে নিয়ে গর্ব করতে পারে না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যাঁরা সব মানুষের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁদেরকে নিয়েই ওঁরা গর্ব করেন। তাদের উদ্দেশ্যেই তাঁরা জানান বারংবার নমস্কার। ❐

(অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তিনি কোলকাতার সাউথ সিটি (দিবা) কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।)

''কত হাজার মরলে তবে মানবে তুমি শেষে, বড্ড বেশী মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে''

অনিকেত মাহাতো

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সদ্যোজাত সন্তানকে রেখে মারা গেলেন এই বাংলার একজন মা, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরো তিন। হাসপাতালে নিত্যব্যবহার্য একধরনের 'ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড', যার নাম রিঙ্গারস ল্যাক্টেট; সরকারি সাপ্লাইয়ের সেই ভেজাল ওষুধের বিষক্রিয়ায় ঘটল এই ঘটনা। ভাবতে অবাক লাগে, আজ ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েও এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটতে পারে! চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিশাল হাতি-ঘোড়া কোনো দামী ওষুধ নয়, সাধারণ 'স্যালাইনের' বোতলে প্রাণ গেল একজনের। তাও আবার একটি মেডিক্যাল কলেজে! এই জায়গায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই ঘটনা কীভাবে ঘটল? এটা কি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা?

আমরা যারা সরকারি হাসপাতালে, মেডিক্যাল কলেজে কাজ করি, এই স্যালাইন নিয়ে সমস্যা আমাদের কাছে নতুন নয়। গত দু'বছরের বেশি সময় ধরে খুব প্রয়োজন না হলে রিঙ্গারস ল্যাকটেট আমরা চালাচ্ছি না। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই, আর জি কর মেডিকেল কলেজের অফ বিভাগে টানা এক বছর ধরে RL আমরা ব্যবহার করিনা)। রোগীদের RL দেওয়ার পরই শ্বাসকষ্ট, জ্বর, কিডনি খারাপ হওয়ার মত ঘটনা ঘটতে আমরা দেখেছি। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ; সবার অভিজ্ঞতা একই। ডাক্তার-নার্সদের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলো তার সাক্ষী। বারবার জানানো হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগের পাহাড় জমেছে, ফাইলের লাল ফিতের ফাঁসে। কিন্তু বাস্তব পাল্টায়নি। মাসের পর মাস একই কোম্পানির স্যালাইন ঢুকেছে হাসপাতালে, বাংলার মানুষের সর্বনাশ হয়েছে দিনের পর দিন।

গতবছরের শেষ দিকে স্বাস্থ্যদপ্তরে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ভেস্তে যায়। কারণ, সিনিয়র স্যার-ম্যামেরা অভিযোগ তুলেছিলেন জাল ওষুধের কারণেই এরাজ্যের প্রসূতি মৃত্যুর হার বাড়ছে। মাননীয় স্বাস্থ্যকর্তারা, যাঁদের বিরুদ্ধে বারবার আঙুল উঠেছে দুর্নীতির দায়ে; সেই বৈঠক বন্ধ করে দেন তাঁরা। যাঁরা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁদেরকে শোকজ করা হয়। এরপরে, ৯ থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে কর্নাটকের বেল্লারি জেলায় ৪ জন প্রসূতি মা মারা গেলেন। তদন্ত প্রক্রিয়ায় উঠে এল উত্তরবঙ্গের চোপড়ার একটি ওষুধ কোম্পানি 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস্'-এর নাম। ২০২৩ সালের মে মাস নাগাদ কর্নাটকের চারটি জেলায় প্রায়সাড়ে ৩২ হাজার 'রিঙ্গার্স ল্যাকটেট' সরবরাহ করেছিল 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস্'। ওই স্যালাইনের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সে রাজ্যে, কর্নাটকের স্বাস্থ্য দফতরে প্রায় ২৭টি অভিযোগ জমা পড়ে। ১৬টির মতো স্যালাইনের নমুনা পরীক্ষায় একটিতেও পাস করতে পারেনি তারা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এই কোম্পানিকে। এর পর টনক নড়ে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরের। সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোলের কর্তাদের নিয়ে ওষুধ কারখানা পরিদর্শন করেন তাঁরা। সামনে আসে ভয়ংকর চিত্র। সারা বাংলার এমনকি অন্যান্য রাজ্যের মানুষের শরীরে ঢুকছে যে ওষুধ-স্যালাইন, তাকে জীবানুমুক্ত করার নূন্যতম কোনো ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন, ওষুধপত্র বানানোর কোনোরকম পরিকাঠামো ছাড়াই এই কোম্পানি প্রাথমিক ছাড়পত্র বা বছরের পর বছর ক্লিয়ারেন্স পেল কী করে? এখনো এই কোম্পানির মালিক বা কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? না হলে, কেন হয়নি? সারা রাজ্যে ও দেশে আরো কত এরকম কারখানা চলছে পরিকাঠামো ছাড়াই?

হাসপাতালে হাসপাতালে যেমন মৃতদেহের মিছিল আজকে পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে, তাতে কেবল ডাক্তার নয় সচেতন নাগরিক হিসাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের জানা দরকার। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা জরুরি; কেবল স্যালাইনের বোতল নয়, সরকারি সাপ্লাইয়ের বা ন্যায্যমূলের ওষুধের দোকানের প্যারাসিটামলের মতো সাধারণ ওষুধ থেকে অক্সিটোসিনের মত জীবনদায়ী ওষুধ; সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে গুনগত মানের ত্রুটি বারবার আমাদের চোখে পড়েছে কাজ করার অভিজ্ঞতায়। অভিযোগ জমা হয়েছে বারবার। আমরা দেখেছি ওষুধে আশানুরূপ কাজ হয়না, আবার কোনো ক্ষেত্রে ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে। আজ স্যালাইনের বোতলের মাধ্যমে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেল, বাক্সের বাকি ওষুধগুলোর গুণগত মানের পরীক্ষা কবে হবে?

এই জায়গায় রাজ্যের স্বাস্থ্যপ্রশাসনের ভূমিকা যেভাবে পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে, তা আরো আতঙ্কের। বিভিন্ন দুর্নীতির অন্ধকারে জড়িয়ে থাকা এই দপ্তরের কর্তারা জাল ওষুধের কারবারিদের আড়াল করেছেন, বছরের পর বছর অভিযোগ চেপে রেখে বা কারখানা পরিদর্শন না করে। তাঁদের এসমস্ত অপদার্থতা

সামনে এসেছে আগেই, গত ৯ই আগষ্টের ঘটনা, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হওয়া ইন্সট্রুমেন্ট কেলেঙ্কারি থেকে মেডিক্যাল বর্জ্য কেলেঙ্কারির মধ্য দিয়ে। যে 'রিঙ্গারস ল্যাক্টেটের' একটিও বোতল কর্নাটকের গুনগত মানের পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, সেই 'রিঙ্গারস ল্যাক্টেট', একই কোম্পানির একই স্যালাইনের বোতল এ রাজ্যের পরীক্ষায় পাশ করেছে ১২ বার।

তাহলে কি দুর্নীতি গুনগত মানের পরীক্ষা পদ্ধতিকেও ঝাঁঝরা করে দিয়েছে? নাকি পরিকাঠামোর অভাবে এ ঘটনা ঘটছে। আমাদের আন্দোলনের শুরু থেকেই আমরা দুর্নীতি এবং স্বাস্থ্যের সর্বস্তরে পরিকাঠামোগত উন্নতির কথা বার বার বলেছি। এই জায়গা থেকেই আমরা স্বাস্থ্য অধিকর্তার অবসান এর দাবি জানিয়েছিলাম, এখন ভেবে দেখুন আমাদের দাবির প্রাসঙ্গিকতা কতটা ছিল। তখন বহু নেতা-মন্ত্রীরা ব্যঙ্গ করেছিলেন আমাদের। আজ দেখা যাচ্ছে কয়েকশো হাসপাতাল বা কয়েকটা মেডিক্যাল কলেজ নয়, একটা মাত্র ড্রাগ কন্ট্রোলের ল্যাবরেটরিতেই যদি পরিকাঠামো না থাকে, তার ফল কী বিপজ্জনক হত্যে পারে! এই ব্যবস্থাটার সংশোধন শুধু নয়, একে ছুঁড়ে ফেলাটাই বোধহয় একমাত্র পথ।

একই সঙ্গে আমাদের আরেকটা দাবিও এখন গুরুত্বপুর্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। শূন্যপদে রিক্রুটমেন্টের দাবি। আমরা জানতে পারছি, স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল রিসার্চ ল্যাবে ৪৫টি টেকনিশিয়ানের শূন্যপদে ১২ জন মাত্র রয়েছেন। ফলে গতবছরের মে মাস থেকে এই বিতর্কিত স্যালাইনের বহু বোতল পড়ে রয়েছে পরীক্ষা না হয়ে। একইসঙ্গে আমরা জানতে পারছি, এই পরীক্ষা না হওয়া বোতল যেগুলোর এখন ব্যবহার হওয়ার কথাই ছিল না, পাশের জেলা থেকে সেসব এসে পৌঁছেছিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্ত স্তরে দক্ষ কর্মী না থাকা বা কনট্রাকচুয়াল কর্মীদের দিয়ে কাজ চালানোর যে ব্যবস্থায় এ রাজ্য অভ্যস্ত তাতে এজাতীয় clerical error হবেই। তার জন্য সাধারণ মানুষের ঘর খালি হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। আন্দোলন চলাকালীন অনেকেই আক্রমণ করেছিলেন আমাদের দাবিগুলোকে 'চেয়ারের দাবি' বলে, আজ ঐ নবজাতক অনাথ বাচ্চাটির সামনে দাঁড়িয়ে এই ব্যঙ্গগুলো আরেকবার করবেন?

এই জায়গাতেই প্রতিবারের মতো আবারও স্বাস্থ্য কর্তারা আঙুল তুলছেন ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের দিকে। নিজেদের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ও অপদর্থতাকে ঢাকতে বন্দুক আমাদের দিকে ঘোরাচ্ছেন, আর সার্কুলার জারি করে বলছেন এই এই ওষুধ দেওয়া যাবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান কি আপনাদের খামখেয়ালে চলবে? কোভিডের পরে আমরা দেখেছি, যখন সরকারি হাসপাতালে অ্যান্টিবায়োটিক ছিল অপ্রতুল, একজন রোগী পাঁচদিন পাঁচরকম অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে বাড়ি যেতেন। আর তারপর ফেরত আসতেন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। আজ যে দশটা ওষুধ আপনারা চালাতে দিলেন না, তার বিকল্প কোথায়?

আপনাদের দায়িত্বটুকু আপনারা পালন করবেন না, দুর্বৃত্ত সব প্রভাবশালীর স্বার্থ রক্ষা করতে চোখ বুজে থাকবেন, ঘুষ খেয়ে বেচে দেবেন গরীব মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার; আর দোষ হবে আমাদের? কোন মেডিক্যাল কলেজের গাইনি বা অ্যানাস্থেসিয়া ডিপার্টমেন্টে এত সংখ্যক ফ্যাকাল্টি আপনারা রেখেছেন, যাতে সমস্ত কেস সিনিয়ররা করতে পারবেন? কোন সিনিয়র ফ্যাকাল্টির কাছে সেই জ্ঞান আছে যে তাঁরা ছত্রাক ভরা স্যালাইন চালিয়ে রোগীকে সুস্থ করতে পারবেন? উত্তরগুলো থাকলে দিয়ে যাবেন স্যারেরা, নাহলে মুখ বুজে মেনে নিন আপনাদের ভুলগুলো, আর ছেড়ে দিন প্রশাসনিক পদ মানুষের দাবি মেনে।

সাধারণ মানুষকে বলার কথা একটাই, ২০০৪-০৫ এর পশ্চিমবঙ্গের ব্লাড টেস্টিং কিট কেলেঙ্কারি, ২০১৭ সালের গোরখপুরের অক্সিজেন কেলেঙ্কারি থেকে গত কয়েক বছরের নিম্নমানের গ্লাভস, রাষ্টপড়া যন্ত্রপাতি - শাসকেরা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে, আমাদের আপনাদের কোল খালি হলে তাদের কিছু যায় আসে না, তারা ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছাতে। ৯ই আগষ্ট অভয়া প্রাণ দিয়ে উন্মোচন করেছিল আর জি করের ভয়ংকর দশা, পাঁচ মাসের মাথায় ৯ই জানুয়ারি মামনি প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের চিত্র। আর কত প্রাণ যাবে এভাবে? ক্ষমতালোভী দুর্বৃত্তরা বোঝে না মানুষের প্রাণের দাম, আন্দোলনের চাপেই তাদের বোঝাতে হয় সেই সত্য আন্দোলনের চাপে, সেই দায় আপনাদের-আমাদের। ❐

শতবর্ষে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
(১৯২৪-২০১৮)

উৎপল ঝা

'তাহাই কবিতা। আমি চতুর্দিকে চোখ রেখে রেখে পৃথিবীর পায়ের ডগা থেকে মস্তক অবধি যা- কিছু দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি নিশ্বাসে যা-কিছু গ্রহণ করছি বুকের ভিতরে যা-কিছুতে হাত রাখছি। কিংবা বাঁ পরেই লাথি মেরে হটাচ্ছি-যা কিছু তাহাই কবিতা।'

'নক্ষত্র জয়ের জন্য' শব্যগ্রন্থের 'তাহাই কবিতা' নামক কবিতায় তিনি তাঁর কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। সাংবাদিক, গদ্যশিল্পী, সম্পাদক, অনুবাদক, ভাষাবিদ প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয় তাঁর সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকলেও, তিনি নিজেকে কবি হিসেবেই পরিচয় দিতে স্বস্তি বোধ করতেন।

এ- বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ - আয়ুষ্কাল আর মাত্র ছ- বছর বাড়লেই তিনি শতবর্ষ স্পর্শ করতে পারতেন।

ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক বঙ্গবাসী হলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। মা প্রফুল্লনলিনী দেবী। নীরেন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোর কালের অনেকটা অংশ কেটেছে, চান্দ্রা গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে দাদু লোকনাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে। সেইসময় চান্দ্রা গ্রামের স্কুলের শিক্ষাদানের পরিবেশ ছিল আতঙ্কজনক- তাই নীরেন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়ে অবাধ-স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠছিলেন। পড়াশুনায় ক্ষতি হচ্ছে এই বিবেচনায় বাবা ও ঠাকুমার তাগিদে দাদু এবং গ্রামের মায়া ছেড়ে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। বঙ্গবাসী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সেন্ট পলস কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে ইতিহাসে স্নাতক হন। এরপর বাবার আকস্মিক অসুস্থতার জন্য উচ্চতর শিক্ষার আশা ছেড়ে সংসারের দায়িত্ব পালনের জন্য ' প্রত্যহ ' দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। এর পর স্বরাজ, নবযুগ , কিশোর, ইউ পি আই , সত্যযুগ ঘুরে ১৯৫১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন।প্রায় একযুগ সম্পাদনা করেন শিশু-কিশোর পত্রিকা ' আনন্দমেলা।'

এদিকে স্কুল জীবন থেকেই কবিতা লেখা বা কাব্য সাধনা শুরু। তাঁর প্রিয় কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, দত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র হলেও, জীবনানন্দ দাশের ' ধূসর পাণ্ডুলিপি ' তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। আর সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকা তাঁকে আধুনিক কবিতার দরজায় পৌঁছে দেয়া ১৯৪৫ সালে কলকাতার রাস্তায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি চালনায় রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ছাত্রের মৃত্যু দৃশ্য নীরেন্দ্রনাথকে এতটাই আলোড়িত করে যে তিনি রামেশ্বরের স্মরণে 'শহীদ রামেশ্বর' নামে একটি কবিতা নিয়ে ফেলেন সেই রাতেই এবং তারপর তা পাঠিয়ে দেন 'দেশ' পত্রিকায়। কবিতাটি একাশিত হলে তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ' নীল নির্জন ' ১৯৫৪ সালে সিগনেট থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশে নীরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর এক সমসাময়িক কবি অরুন কুমার সরকারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরপর ক্রমান্বয়ে একে একে প্রকাশিত হয় প্রথম নায়ক , নীরক্ত করবী, নক্ষত্র জয়ের জন্য, কলকাতার যীশু, উলঙ্গ রাজা, কবিতার বদলে কবিতা, পাগলাঘন্টি, জঙ্গলে এক উন্মাদিনী, সন্ধ্যারাতের কবিতা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৪ সালে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।

কবিতা রচনার পাশাপাশি গদ্যরচনাতেও তাঁর সবিশেষ খ্যাতি রয়েছে। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিসংযুক্ত উপন্যাস ' পিতৃপুরুষ ' ছাড়াও 'নীরবিন্দু'-তে নিজের জীবনের কথা আশ্চর্য সাধুভাষায় তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ' কবিতার ক্লাস', 'কবিতা কী ও কেন', 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা'।'কবিতার ক্লাস' সবিশেষ জনপ্রিকা অর্জন করেছিল। বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর বহু আলোচিত এন্থ - বাংলা কী লিখবেন, কেন নিখবেন। এছারাও বেশ কয়েকটি বিদেশি গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করেছেন তিনি।

সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন তারাশঙ্কর পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, রাজ্য সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কার। কলকাতা, বর্ধমান এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য হল তাতে অতি-আধুনিকতার জটিলতা নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতোই তিনি প্রায় মুখের ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। সাংসারিক জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে তিনি কবিতার মাম- মশলা সংগ্রহ করে কাব্যরূপ দিয়েছেন। তিনি এও মনে করতেন কবির কাজ জীবনের অসঙ্গতি, অন্যায়-অবিচারকে কবিতায় তুলে ধরে সমাজকে ধাক্কা দেওয়া। তার কাজ নয় বন্দুক নিয়ে রাস্তায় নামা। কবি দেবারতি মিত্রর ভাষার 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা ঝরঝরে, তরতরে। স্মার্ট , সপ্রতিভ ; সমসাময়িকতা ও সামাজিক সচেতনতা তাকে জল হাওয়ার মতো জড়িয়ে আছে।'

তাঁর কিছু কিছু কবিতা যেমন উলঙ্গরাজা, আবহমান, কলকাতার যীশু, হ্যালো দমদম, অমলকান্তি, পাগলাঘন্টি, দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে, বাতাসী প্রভৃতি কবিতা কবিতাপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘোরে।

অন্যদিকে তিনি ছিলেন এক জীবন-রসিক মানুষ। কলকাতা শহরে অলি-গলি, খাদ্য- খোরাক সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষায় তিনি ছিলেন এক 'সেতু পুরুষ' । যিনি কীনা ' জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত থেকে শক্তি-সুনীল - শঙ্খ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে থেকেছেন এক উজ্জ্বল সেতু।'

শতবর্ষে তাঁর কবিতা দিয়েই গঙ্গাজলে পূজা --- তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঃ

'কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে, এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালবাসে।
ফুরয় না তার কিছুই ফুরয়না
নটে গাছটি বুড়িয়ে ওঠে ,
কিন্তু মুড়য় না।'
(আবহমান) ❐